আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

'নালন্দা', 'বিক্রমশিলা', 'তক্ষশিলা' ও 'সাজি'

প্রণেতা

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
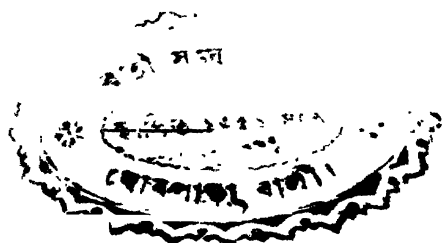
শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ

বরদা এজেন্সী

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট

কলিকাতা

দাম পাঁচ সিকা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

'নালন্দা', 'বিক্রমশিলা', 'তক্ষশিলা' ও 'সাঞ্চি
প্রণেতা
বিশ্বভারতীর অধ্যাপক
শ্রী ফণীন্দ্রনাথ বসু, এম-এ

প্রকাশক

শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী, এম-এ, বি-এল,

বরদা এজেন্সী,

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

১১০১

৯১।২নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট

নববিভাকর প্রেসে

শ্রী কপিলচন্দ্র নিয়োগী

দ্বারা মুদ্রিত।

সূচিপত্র

জীবন-পঞ্জী

১৮৬১—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম।

—গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা।

১৮৭০—হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন।

১৮৭৪—এলবার্ট স্কুলে যোগ দেন।

১৮৭৯-৮২—মেট্রোপলিটান ও প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠ করেন।

১৮৮২—উচ্চবিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রথম বিলাতে যান।

১৮৮৭—এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-এস-সি উপাধি লাভ করেন।

১৯৮৯—স্বদেশে প্রত্যাগমন, প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৯২—বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা আরম্ভ করেন।

১৯০৪—দ্বিতীয়বার বিলাত গমন—ইউরোপীয় ল্যাবরেটরী দেখিতে গবর্ণমেণ্ট বিলাত পাঠান।

১৯১০—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হন।

১৯১২—সি, আই, ঈ উপাধি পান।

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে বিলাত যান—তৃতীয়বার।

—Durham বিশ্ববিদ্যালয়ে Honorary D. Sc. উপাধি পান।

১৯১৪—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

১৯১৪—প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বিদায় লন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগ দেন।

১৯১৬—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Extension বক্তৃতা দেন।

—ভারতীয় জাতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি হন।

১৯১৯—"নাইট" উপাধি লাভ করেন।

১৯২১—পুনরায় বিলাত যাত্রা করেন।

১৯২২—খুলনা দুর্ভিক্ষে সাহায্য।

—উত্তরবঙ্গ বন্যায় সাহায্য।

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ হাজার টাকা দান ও নাগার্জ্জুন পুরস্কার স্থাপনা।

১৯২৩—আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

—আমেদাবাদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

১৯২৪—উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

—ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি স্থাপনা।

১৯২৫—শিউড়ি মেলার উদ্বোধন।

—শান্তিনিকেতন পরিদর্শন।

—নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা।

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" অধ্যাপকরূপে বক্তৃতা।

১৯২৬—বিলাত যাত্রা।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রথম অধ্যায়

"—হে তেজস্বী! অগ্নিষ্বাত্ত! হে তপস্বী! স্বদেশ বিদেশ
ভিন্ন নহে তব চোখে; তোমার নাহিক আত্মপর;
ঘোষণা করেছ শুধু নিত্য সত্য; চিত্ত স্বার্থ-লেশ-
শূন্য তব চিরদিন; ধৃতব্রত তুমি ঋতম্ভর।—"

এ-কথা আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে উদ্দেশ করে' বল্‌তে পারি। তিনি বিংশ শতাব্দীর ত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনি সংসার ত্যাগ করেন নি বটে, কিন্তু সংসারে থেকেও নির্ব্বিকার—ছাত্রসমাজের জন্য তাঁর সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন। যদিও তিনি ধনীর সন্তান, যদিও তিনি দু'হাতে টাকা রোজগার করেন, তবু তিনি অতিসামান্য ভিখারীর মত দীনভাবে দিন যাপন করেন। ইচ্ছা কর্‌লে তিনি আজীবন বিলাসে ব্যসনে মগ্ন থাকতে পার্‌তেন, কিন্তু তা না করে' তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের বরমাল্য গলে পরেছেন। স্ব-ইচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করেছেন বলে' আজ বাংলার—

তথা ভারতের ছাত্রসমাজের কাছে তিনি বরেণ্য, প্রণম্য। তাই আজ বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সারা দেশে তিনি "দরিদ্রের বন্ধু", "দীনের পালক" বলে' পরিচিত। তাই আজ বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁর সৌম্য ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করে' আপনাদিগকে ধন্য মনে করতে চায়, নিজেদের শ্রম সার্থক মনে করতে চায়।

তাঁর নতুন চিন্তাধারা বাংলার রক্ষণশীল সমাজে ধীরে ধীরে নবযুগের প্রবর্ত্তন কর্‌ছে। তাঁরই উদ্দীপনার ফলে, তাঁরই উৎসাহে, তাঁরই প্ররোচনায় আজ ছাত্রমহলে নতুন জাগরণের সাড়া পড়ে' গেছে। বাংলার ছাত্রমহল আজ আর সেই পুরাতন মার্গে যেতে চায় না, গতানুগতিকের প্রবল স্রোতেও গা ভাসিয়ে দিতে চায় না, তারা চায় নতুন পথে নতুন আলোকের সাহায্যে নতুনের আবাহন কর্‌তে। বাংলাদেশময় এই যে নবীনের পূজার আয়োজন হচ্ছে, সেই মহাপূজার প্রধান পুরোহিত—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র। তাই আমরা তাঁকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও যুগপ্রবর্ত্তকরূপে দেখ্‌তে পাই। তাই তিনি স্বয়ং জগতের সাম্‌নে এক বিরাট আদর্শ খাড়া করেছেন, যার অনুকরণ কর্‌তে আজ সারা ছাত্রসমাজ ব্যাকুলভাবে ছুটে আস্‌ছে। তাঁর চিন্তার নব ধারা, তাঁর অভাবনীয় কর্ম্মশক্তি বাংলার ভাবরাজ্যে সত্য সত্যই এক

প্রকাণ্ড ওলট্-পালট সাধনে ব্যস্ত হ'য়েছে। বিজ্ঞানের দিক্ থেকে দেখ্‌লে—তাঁর মত শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক আজও বাংলা-দেশে জন্মায় নি—তাই তিনি শুধু বাংলার বা ভারতের গৌরব নন—তিনি পৃথিবীর গৌরবস্বরূপ। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হয়েও, তিনি তাঁর মনোরাজ্যের সদ্‌গুণাবলীকে নষ্ট হ'তে দেন নি, সেজন্য তাঁর হৃদয় এমন উদার, এত মহান্‌। তিনি কর্ম্মবীর—তাই তাঁর কাছে জাতিভেদের বিচার নেই; ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, চণ্ডাল আর মাহিষ্য যেই তাঁর কাছে আসুন না কেন, তাঁর চক্ষে সকলেই সমান। তিনি চান—যাদের আমরা "ছোটজাত" বলে' ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করি, যাদের আমরা কত যুগযুগান্তর ধরে' পদতলে দলে আস্‌ছি, তাদের যেন ভাই বলে' তুলে আলিঙ্গন করি। তাই কবির ভাষায় বল্‌তে হয়ঃ—

"জাতির প্রতিষ্ঠা বাড়ে ন্যায় নিষ্ঠ শুচি অনুষ্ঠানে
এ তোমার মূলমন্ত্র, এ তোমার প্রাণের সাধনা;
জয় ডঙ্কা নাদে তাই আতঙ্কিত হতে তুমি প্রাণে—
দুর্ব্বলের পীড়া ভয়ে—"
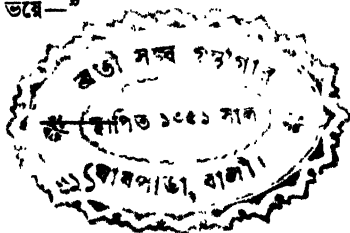
দ্বিতীয় অধ্যায়

জন্মকথা ও ছাত্রজীবন

সারা বাঙালী জাতির একটা মস্ত বড় কলঙ্ক আছে যে, বাঙালী ব্যবসা কর্‌তে জানে না, কখনও স্বাধীনভাবে জীবিকা উপায় কর্‌তে শেখে না, কেবল কেরাণীগিরি কর্‌তে মজবুত। এমন করে' এ-জাত দাসখতে নাম লিখিয়েছে বলে' অনেকে এ-জাতকে ঘৃণাভরে কেরাণীর জাতি (a nation of clerks) বলে' থাকেন। এটা আমাদের অদৃষ্টের খুব সৌভাগ্য আর সুখের বিষয় বলে' মান্‌তে হবে যে, এই হেয় আর অবজ্ঞেয় জাতির মধ্যেও সময়ে সময়ে অনন্যসাধারণ কর্ম্মবীর দেখা যায়। এ-যুগেও স্বনামধন্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আর স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জগৎসভায় বাঙালীর নাম আর সম্মান উজ্জ্বল করে' রেখেছেন।

এখানে আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা বল্‌ব। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়েছে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, তাঁর জন্মগ্রহণের পর থেকে। প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ ছাত্রজীবন ছিল, আধুনিক ভারতে তিনি সেই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করেছেন। গ্রামের পাঠশালা

থেকে তাঁর যে ছাত্রজীবন স্থুরু হয়েছে, তার এখনও শেষ হয় নি। এখন যদিও তিনি নানা কাজে ব্যস্ত, যদিও চর্‌কা, খদ্দর, রাজনীতি ও বেঙ্গল কেমিক্যাল তাঁর অনেকটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তা হলেও তিনি এখনও সেই আদর্শ ছাত্র। সারাজীবন তিনি ব্রহ্মচারীর মতন কাটাচ্ছেন, বিবাহ না করে' তিনি আদর্শ গুরুরূপে ছাত্রসমাজের কাছে পূজিত। সেই জন্য একবার বিলাতের টাইম্‌স্‌ কাগজ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিল—সারাজীবন তিনি অবিবাহিত রয়েছেন, তিনিই পৃথিবীর কাজের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় গুরুর আদর্শ অনুভব কর্‌তে পেরেছেন। ছাত্র সমাজ তাঁর কাছে যে আদর্শ পেয়েছে, সেজন্য কৃতজ্ঞ।

জন্মকথা

সে আজ ৬২ বছর আগের কথা—যখন দেশের হাওয়া, চিন্তার ধারা, দেশের অবস্থা একেবারে আলাদা ছিল, যখন গ্রামে গ্রামে জ্ঞান বিতরণের জন্যে স্কুল কলেজ খোলা হয় নি—বাংলার সেই যুগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম হয়। যে খুলনা জেলা শ্রীমধুসূদন, কবি কৃষ্ণচন্দ্র, কবি দীনবন্ধুর প্রিয় জন্মভূমি বলে' পরিচিত ও ধন্য—সেই খুলনা জেলাতেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

ছেলেবেলায় প্রফুল্লচন্দ্র সকলের কাছে "ফুলু" বলে'

পরিচিত ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্মমেধা সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল। কালে যে তিনি একজন অসাধারণ পুরুষ হবেন, তার পরিচয় তাঁর অসমসাহসে পাওয়া যেত। তাঁর প্রকৃতি বড় দুষ্ট ছিল, তিনি গ্রামে সকলের ওপর অত্যাচার করে' বেড়াতেন। তবু তাঁর কাজ, তাঁর বুদ্ধি, তাঁর মেধা প্রমাণ কর্‌ত যে, Child is the father of man.

আমাদের জানা দরকার—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রে আমরা যে প্রতিভার বিকাশ দেখ্‌তে পাই, ছোটবেলা থেকেই যার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল—তার মূল উৎস কোথায়। এর উৎপত্তি খুঁজ্‌তে আমরা কোথায় যাব ? কি রকমে এ অপূর্ব্ব প্রতিভার ব্যাখ্যা কর্‌ব ?

এ-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেতে হ'লে আমাদের তাঁর পিতার চরিত্র আলোচনা কর্‌তে হবে। জগতে যাঁরা নানা পথে প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বড় হয়েছেন—তাঁরা সকলে সে প্রতিভা মাতাপিতার কাছ থেকেই পেয়েছেন। এ-কথা যেমন কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গবিদুষী সরোজিনী নাইডুর পক্ষে খাটে, তেমনি খাটে ডাক্তার রায়ের সম্বন্ধে। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র রায় সে-যুগের শিক্ষিত লোক ছিলেন—তাঁর মন দেশী বিলাতী দুই সভ্যতার অতল জলে ডুব দিয়েছিল।

আজ যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিদ্যায়, বুদ্ধিতে আর প্রতিভার গুণে সারা জগতের জ্ঞানী আর গুণীর কাছ থেকে সাদর পূজার অর্ঘ্য পেয়ে আস্‌ছেন—তার মূলে তাঁর পিতৃদেবের উদার শিক্ষা। তাঁর পিতার মধ্যে যে প্রতিভার যে গুণরাশির স্ফুরণ হয়েছিল, তাঁর মধ্যে যে জ্ঞানের বীজ উপ্ত হয়েছিল—তার পূর্ণ বিকাশ আমরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রে দেখ্‌তে পাই। তখন দেশে ইংরাজী শিক্ষার হাওয়া দেশময় বইতে স্থুরু করে নি—তবু সেই নতুনের আবাহনের যুগে হরিশ্চন্দ্র রায় নিজের উৎসাহে নিজের চেষ্টায় নিজের গ্রামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তখন তিনি বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝেছিলেন যে, দেশের চিন্তার ধারা নতুন করে' গঠন কর্‌তে হ'লে, পুরাতনের দোষরাশি ধুয়ে দিতে হ'লে গ্রামে গ্রামে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন দরকার। তিনি পুত্র প্রফুল্লচন্দ্রকে শৈশব থেকেই এমনভাবে স্থশিক্ষা দিয়েছিলেন, এমনভাবে তাঁর সরল উদার মনটি তৈরি করেছিলেন, যার ফলে তাঁর পুত্র জগতের কাছে গণ্য মান্য ও বরেণ্য হ'তে পেরেছেন। তাঁর পিতার বিদ্যালয়েই তাঁর হাতে খড়ি হয়। সেই থেকে তাঁর যে ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়েছে তার বোধ হয় আর শেষ হবে না—সারা জীবনটাই বোধ হয় তিনি ছাত্র হয়ে কাটাবেন। কারণ তিনি নিজেই

বলেছেন—“আমি এখনও নিজেকে ছাত্র বলে’ গণ্য করি। ঐ-জীবন ত্যাগ করে’ একদিনও অন্য জীবনে পদার্পণ করেছি বলে মনে হয় না।”

এই কথাই আরও জোর করে’ তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ—“জ্ঞানের অনুশীলন আমি করে’ থাকি। আমি আজীবন ছাত্রভাবেই আছি। আমার শৈশব, কৈশোর, যৌবন কখন্ চলে’ গেছে বুঝ্‌তে পারি নি, আজ বার্দ্ধক্যে পা দিয়ে আমি সেই ছাত্রই আছি। আমি দিনের মধ্যে দু’ঘণ্টা নিভৃতে ভাল পুস্তককে সঙ্গী করে’ কাটিয়ে দি—দিন সার্থক হয়। জগতে যা কিছু সৎচিন্তা, উৎকৃষ্টভাব আছে, যা-কিছু উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা দেয় তার সবই পুস্তকে নিহিত।”

দিন সার্থক কর্‌বার জন্যে তিনি যে দিনের মধ্যে দু’ঘণ্টা নিভৃতে ভাল বই সঙ্গী ক’রে কাটিয়ে দেন—তা খুব সত্য। যে কেউ তাঁর সঙ্গে বিকালে দেখা কর্‌তে গেছেন তিনিই তাঁর হাতে ২।১ খানা বই দেখ্‌বেন। সেদিন দেখ্‌লুম তাঁর হাতে বেলজিয়ান্ কবি মেটারলিঙ্কের একখানা বই আর ‘প্রবাসী’ মাসিক-পত্রখানা।

পিতার যে বিদ্যালয়ে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রথম হাতে খড়ি হয়, তার কথা তিনি কখনও জীবনে ভুলেন নি, তাই

যখন তিনি দু' হাতে পয়সা রোজগার করতে আরম্ভ করলেন, তখন নিজের ভিটায় সেই পুরাণ স্কুলটিতে নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তখন হ'তে সেটি তাঁরই পিতৃদেবের নামে পরিচিত, আর ডাক্তার রায় নিজে সেই স্কুলটির সব ব্যয়ভার বহন করে' পিতার কীর্ত্তি বজায় রেখে আস্‌ছেন।

আর একটি সুবিধা প্রফুল্লচন্দ্র পেয়েছিলেন। সেই গ্রামেই তাঁর পিতার একটি সুন্দর লাইব্রেরী ছিল। প্রফুল্ল-চন্দ্র ছোট বয়সেই সেই লাইব্রেরীর সব বই পড়ে শেষ করেছিলেন। শৈশব থেকে তিনি যে পড়বার অভ্যাস পেয়েছেন, সে অভ্যাস তাঁর এখনও আছে।

আগেই বলেছি, তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্র তাঁর শিক্ষার ভার নিজের ওপর নিয়েছিলেন। যখন গ্রামের পাঠ শেষ হোলো, তিনি তাঁকে কলিকাতায় এনে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি করে দেন। তিনি বলেছেন :—"১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন আমি হেয়ার স্কুলে পড়ি, তখন কেশব সেন বিলাত গিয়েছেন, দেশের শিক্ষিত মহলে তখন একেশ্বরবাদ আলোচনা চল্‌ছে।"

এই একেশ্বরবাদ আলোচনায় তিনি নিজেও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন, তার ফলে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে ঝুঁকে

পড়েন। আরও একটা মস্ত আকর্ষণ তাঁর সামনে ছিল—সেটি প্রসিদ্ধ বক্তা কেশবচন্দ্র সেনের তেজস্বিনী বক্তৃতা শোনবার প্রবল ইচ্ছা। সে ইচ্ছার গতি তিনি রোধ করতে পারেন নি, তিনি কেশব সেনের বক্তৃতাবন্যায় যেন ভেসে গেলেন—অবশেষে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে যোগ দিলেন। যৌবনে তাই তাঁর একটা নেশা ছিল—সভা-সমিতিতে কেশবচন্দ্র সেন আর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শোনা। সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনবার জন্যেই তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ, সে সময় সুরেন্দ্রনাথ সেই কলেজে অধ্যাপক ছিলেন) ভর্ত্তি হলেন—অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বিজ্ঞানের বক্তৃতায়ও যোগ দিতে থাকলেন।

প্রফুল্লচন্দ্রের ভাগ্যে অটুট স্বাস্থ্য কখনও ঘটে নি, অনেক সময় শরীরের অসুস্থতার জন্য তাঁর পাঠের ব্যাঘাত জন্মেছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও তিনি কখন জ্ঞান-সংগ্রহে বিরত হন নি। অসুখের সময় তিনি যে শুধু ডাক্তারের ঔষধ-ভাণ্ডার শেষ করতেন তা নয়, পিতার সাহিত্য-ভাণ্ডারও নিঃশেষ করতেন। স্কুলের পড়া ছাড়া, তিনি বাইরেকার প্রকৃতির বিশালরাজ্য থেকে জ্ঞান লাভ

করবার জন্যে চিরদিনই ব্যস্ত। আর সেই জন্যই তিনি আজ বাংলার গৌরব, ভারতের গৌরব।

গোড়া থেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের ঝোঁক ছিল—ইতিহাসের ওপর। তিনি ইতিহাস পড়তে প্রথম থেকে বড়ই ভালবাসেন। তিনি তাই মাঝে মাঝে বলেন—"I am a chemist by mistake" অর্থাৎ আমি ভুল করে' রাসায়নিক হয়েছি। তিনি ছাত্রজীবনের বেশীর ভাগ সাহিত্য পড়েই কাটাতেন, কিন্তু শেষটা ভাবলেন—"আমি বিদ্যার সমুদ্রের শেষ সীমায় যাচ্ছি, আর আমি বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জান্‌ব না ?" সেই যে তাঁর বিজ্ঞান জান্‌বার জন্যে ঝোঁক হোলো, তার ফলে আজ তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। তাই বলে' তিনি একজন কম ঐতিহাসিকও নন, তাঁর শ্রেষ্ঠ ইতিহাস—"History of the Hindu Chemistry"—তাঁকে ঐতিহাসিক বলে' সাহিত্য-জগতে চিরস্মরণীয় করে' রাখ্‌বে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম বিলাতযাত্রা

তখনকার সময়ে 'কালাপানি' পার হ'তে অনেকেই সাহস না করলেও, প্রফুল্লচন্দ্রের সে সৎ-সাহসের অভাব ছিল না। এমন কি তাঁর পিতৃদেবও স্থির করে' রেখে-ছিলেন যে, এখানকার পড়া শেষ হ'লে পুত্রকে ইংলণ্ডে সুশিক্ষার জন্যে পাঠাবেন—তা সমাজ যতই আপত্তি করুক না কেন! সামাজিক আপত্তি উঠেছিল কি না জানি না, কিন্তু আর্থিক দিক থেকেই তীব্র আপত্তি এল। তাঁর পিতার সম্পত্তি তখন অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষতঃ দানে তিনি সদা মুক্তহস্ত ছিলেন। নানা দাতব্য কাজে, স্কুল পরিচালনায় ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক টাকা খরচ করতেন। তাই প্রফুল্লচন্দ্রের বিলাত যাবার যতই প্রবল ইচ্ছা থাকুক না কেন, অর্থের অভাবে বিলাত যাওয়া ঘট্‌ল না।

এত বাধা, এত বিপদ সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র পশ্চাৎপদ হবার পাত্র নন। তাঁর প্রতিজ্ঞা অচল, অটল—বিলাত যে কোন উপায়েই হোক যেতে হবে। তখন তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করে' Gilchrist Scholarship সংগ্রহ

করেন, সেই বৃত্তি পেয়ে তিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে পেরেছিলেন। কিন্তু এ-সংবাদ তাঁর জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এই সামান্য বৃত্তির ওপর নির্ভর করে' আর কারও কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য না নিয়ে তিনি বীরের মত সাহসে মন বেঁধে বিলাত যাত্রা করলেন। সমাজের ভয়, অর্থের তাড়না, দুশ্চিন্তার জ্বালা—কিছুতেই তাঁকে কাতর কর্‌তে পার্‌ল না, তাঁর প্রতিজ্ঞা টলাতে পার্‌ল না।

বিলাতে যে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে যান—সেই বিজ্ঞানের মায়া তিনি ছাড়্‌তে পারেন নি, সেই বিজ্ঞানের সেবায় তিনি তাঁর সারা জীবনটি উৎসর্গ করেছেন। আর সেই বিজ্ঞানে তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কার দিন দিন তাঁর যশোসৌরভ দেশে দেশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাই আজ তাঁর ও তাঁর প্রবর্ত্তিত বাংলার বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর (School of Bengali Chemists) কীর্ত্তিতে সারা জগৎ ভরে গেছে।

ছয় বছর তাঁকে বিলাতে নির্ব্বাসন যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে' তিনি নিজের প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেন নি। কিসে বিলাতে ভারতের কীর্ত্তি, ভারতের গৌরবের কথা সর্ব্বদা সজাগ থাকে, যাতে

তাঁর দ্বারা দেশের নাম বাড়ে তিনি কেবল তারই চেষ্টা করতেন। সেখানে তিনি অধ্যাপক Tait ও Crum Brown-এর বক্তৃতা খুব আনন্দের সঙ্গে শুনতেন। আর সেই সঙ্গে ছিল তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা। সেই সাধনার ফলে তিনি ছয় বছরে Edinburgh University তে শ্রেষ্ঠ উপাধি Doctor of Science নিতে পেরেছিলেন। তাঁর আগে আর একজন বাঙালী এই উচ্চ উপাধি পেয়েছিলেন, তিনি স্বনামধন্য ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়, 'বাংলার কোকিল' সরোজিনী নাইডুর পিতৃদেব। প্রফুল্লচন্দ্র তার পরে এ-উপাধি পেয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, বাঙালী যুবক জ্ঞানে, বিদ্যায়, পরিশ্রমে বা সাধনায় বিলাতী ছেলেদের চেয়ে কোনও অংশে হীন নয়। আর যদি তাদের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া যায়, তবে তারাও জগতের জ্ঞানের রাজ্যে নতুন নতুন রত্ন উপহার দিতে পারে।

তাঁর লেখবার ক্ষমতার পরিচয়ও তিনি বিলাতে অবস্থান করবার সময় দিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে একখানা বই লেখেন, তার নাম দেন— "সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ভারতের অবস্থা।" এতে তিনি দেখান যে, তিনি কেবল একজন বড় বৈজ্ঞানিক নন,

তিনি একজন শক্তিশালী লেখক ও তাঁর তেজস্বী লেখা পড়ে বিলাতের রাজনৈতিক নেতারা তাঁর লেখার খুব প্রশংসা করেছিলেন। তিনি যে কালে একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক হবেন তার পরিচয় এই থেকেই পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি সিরাজগঞ্জে ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতিরূপে তিনি বলেছিলেন ঃ—

"৪০ বৎসর পূর্ব্বে এডিনবার্গে যখন বি, এস্-সি পড়ি, তখন "India and the British Rule" নামে একখানা পুস্তিকা লিখেছিলাম। ফলে লর্ড্ বাইরণের মত, "awoke one fine morning and fonnd myself famous." (একদিন সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম যে আমি প্রসিদ্ধ হয়েছি) এই রকমভাবে রাজনীতি চর্চ্চা করেছি, সমাজ সংস্কার আন্দোলন করেছি, নানাপ্রকার কল কারখানা গড়বার চেষ্টা করেছি, বই লিখেছি আবার সঙ্গে সঙ্গে রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন ও মৌলিক গবেষণা করেছি।"

(বঙ্গবাণী, কার্ত্তিক, ১৩৩১)।
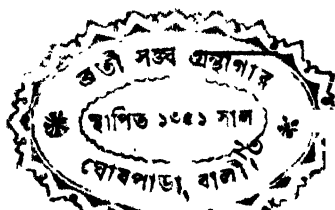
চতুর্থ অধ্যায়

কর্ম্ম-জীবন

প্রফুল্লচন্দ্রের সারা জীবনটাই কর্ম্মময়, তাই কর্ম্ম-জীবন বল্লে তাঁর জীবনের কোন একটা অংশ পৃথক্‌-ভাবে বোঝবার উপায় নেই।

কর্ম্মই তাঁর জীবনের লক্ষ্য—কর্ম্মই তাঁর জীবনের আদর্শ। তাই তিনি বিলাত থেকে এ দেশে আস্‌বামাত্রই ১৮৮৭ অব্দে নতুন উদ্যমে নতুনভাবে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করে' দেন। প্রথমেই তিনি Presidency College-এ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সেই পদে বৃত থেকেই তিনি বিজ্ঞানের নবতত্ত্বের অন্বেষণে ব্যস্ত হন। এই কলেজে তিনি গবেষণা করবার অনেক সুবিধা পান। এখানে ব'সেই তিনি কতদিন কঠোর সাধনা করে' কাটিয়েছেন। যখন কোন একটা কঠিন বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন অনেক সময় আহার, নিদ্রা, সব কথা একেবারেই ভুলে যান—কোন কথাই মনে থাকে না—নিজের গবেষণার কথা ছাড়া।

সব প্রথম তাঁর গবেষণার ফল বেরুল—Journal of Asiatic Society of Bengal-এ। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—Mercurous Nitrite। যেমনি এ-প্রবন্ধটি ছাপা হ'য়ে বেরুল, অমনি ইউরোপের সারা বৈজ্ঞানিক মহলে

একটা মহা হৈ-চৈ পড়ে' গেল। ইংলণ্ডের আর ফরাসীদেশের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতরা বাঙালী লেখকের খুব সুখ্যাতি করতে লাগলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কাগজ Nature বল্লেন—"এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকা ত কখনও রাসায়নিক গবেষণাগারে আদর পায় নি, কিন্তু এবারে বাঙালী রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দ্র যে গবেষণার কথা বলেছেন তা সকলকার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার যোগ্য।"

ডাক্তার রায়ের নাম এই রকমে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তিনি জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক জন হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর নামেতে, তাঁর যশেতে ভারতমাতারও মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের একটি গুণ এই যে, তিনি কখনও একলা সব গৌরব, সব যশ কিনতে চান নি, নামের জন্য পাগল হন নি। তাই গোড়া থেকেই তিনি নিজের পার্শ্বে একদল ছাত্র তৈরি করেছেন। তিনি নিজে হাতে ধরে' সেই সব ছাত্রদের গবেষণার নিয়ম-পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁর পায়ের তলায় বসে' বিজ্ঞানের সব চেয়ে উচ্চ শিক্ষা পেয়েছেন, আর তাঁরই কাছে সে বিদ্যা সফল করবার চেষ্টা করছেন। এই রকমে ক্রমে তাঁর ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যেতে

লাগ্‌ল—তাঁর সহকারীদের মধ্য থেকে অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক বেরিয়ে পড়্‌ল। এই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী পৃথিবীতে "The School of Bengali Chemists" বা বঙ্গীয় রাসায়নিক-মণ্ডলী নামে পরিচিত। আর এই মণ্ডলীর স্থাপয়িতা ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ উপাধিধারী, আবার অনেকে ডাক্তার উপাধি পেয়েছেন। যেমন ডাক্তার পঞ্চানন নিয়োগী, ডাক্তার রসিকলাল দত্ত, ডাক্তার নীলরতন ধর, ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি। সেই জন্যে অনেকে ডাক্তার রায়কে Father of many Ph. D's and Premchand Roychand Students বলে' থাকেন।

ডাক্তার রায়ের কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপের উপর আস্থা নেই। তাই তিনি এমন ছাত্রকেও গবেষণার জন্যে নেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পায় নি অথচ কোন একটি বিষয়ে খুব পারদর্শী। তাঁর এই রকম একজন ছাত্র ছিলেন—তাঁর নাম শ্রীযুক্ত রক্ষিত, তিনি বি,এস্‌-সি পরীক্ষায় ফেল হন। কিন্তু তা হ'লে কি হবে—ডাক্তার রায় পাকা জহুরী কি না, তাই তিনি রত্ন ঠিক চিনে ফেল্লেন। যখন তিনি দেখলেন যে, শ্রীযুক্ত রক্ষিতের গবেষণার প্রবৃত্তি আছে, তখন তিনি তাঁকে নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন। তাই ডাক্তার রায়

বলেন—"By a singular piece of good fortune I happened to discover him"—অর্থাৎ "সৌভাগ্যক্রমে আমি তাকে আবিষ্কার করে' ফেলেছিলাম।" তাঁরই সাহায্যে তিনি Amine Nitrate আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছিলেন। আরও অনেক বিষয়ে শ্রীযুক্ত রক্ষিত তাঁর গুণের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এখন গাজিপুরে আফিম বিভাগে সরকারী কাজ করছেন—যাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় বি,এস্‌-সি উপাধি পাবার অনুপযুক্ত বলে' স্থির করেছিল!

তাঁর অমায়িক ব্যবহারের জন্য ছেলেরা তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করে, তিনিও নিজের হাতেগড়া ছাত্রদের নিজের ছেলের মত স্নেহ করেন। যাঁরা বিজ্ঞান জগতে তাঁর সুনাম, তাঁর খ্যাতি বজায় রেখেছেন, তাঁদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা। যখন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিদায় নেন, তখন তিনি গর্ব্ব করে' নিজের ছাত্রদের কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন:—"তোমরা জান যে, আমি কখনও জাগতিক ধনসম্পত্তি খুব সাবধানের সঙ্গে রাখিনি। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রেসিডেন্সী কলেজে এতদিন চাকরীর পর আমি কি ধনদৌলত সঞ্চয় করেছি—তা'হলে আমি ইতিহাসের Cornelia-র ভাষায় জবাব দেব। তোমরা নিশ্চয় Cornelia-র গল্প জান, এক

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক তাঁর কাছে এসে গর্ব্বের সঙ্গে তার ধন-দৌলত Corneliaকে দেখাচ্ছিল, এবং তাঁর কি সম্পত্তি আছে দেখাতে অনুরোধ কচ্ছিল। তাতে তিনি যে পর্য্যন্ত না তাঁর ছেলেরা আসে ততক্ষণ তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। যখন ছেলেরা স্কুল থেকে এল, তখন তাদের দেখিয়ে বল্লেন—"এরাই আমার রত্ন।" আমিও কর্ণেলিয়ার মত একজন রসিকলাল দত্ত, একজন নীলরতন ধর, একজন জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, একজন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়ে বলব—'এরাই আমার রত্ন।'

এ-সম্বন্ধে ডাক্তার চুনীলাল বসু বলেছেন :—"It was Sir P. C. Ray, the distinguished Indian Chemist and our esteemed colleague, who laid the foundation of higher research-work in Chemistry proper in Bengal, while he was the Professor in that subject in the Presidency College. Subsequently, Dr. Ray, with the help of his devoted students, organised and started the Indian School of Chemistry in the Presidency College. This School has, up to the present time contributed nearly 200

original articles which have been published mostly in the Journal of the Chemical Society, and also in other Scientific Publications in India, England, America and Germany. Dr. Ray himself is responsible for about 50 per cent of these valuable original contributions."

এর ভাবার্থ এই যে, যখন বিখ্যাত ভারতীয় রাসায়নিক স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তখন তিনিই বাংলা দেশে উচ্চ রাসায়নিক গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে ডাক্তার রায় তাঁর ভক্ত ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে প্রেসিডেন্সী কলেজে 'ভারতীয় রাসায়নিক মণ্ডলী' স্থাপন করেন। এই মণ্ডলী আজ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন, সেই সব প্রবন্ধ কেমিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকায় ও ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মানীর অন্য অন্য বৈজ্ঞানিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। আর ডাক্তার রায় নিজে এই মৌলিক গবেষণার অর্দ্ধেকের জন্য দায়ী।

পঞ্চম অধ্যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল

বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ছাড়া ডাক্তার রায় এমন আর একটী কাজ করেছেন, যাতে বাংলাদেশে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। সেটী তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রকাণ্ড কারখানা। তিনি তখন সামান্য অধ্যাপক হলেও, সাহসের ওপর নির্ভর করে' যে ক্ষুদ্র কারখানা আরম্ভ করেন, আজ সেটী বাংলাদেশে সকলের চেয়ে বড়। এ কারখানার ইতিহাস অনেকটা উপন্যাসের মত শোনায়। বাস্তবিকই শুনে আশ্চর্য্য হতে হয় কত সামান্য অবস্থা থেকে এর উৎপত্তি, আর আজ এর পরিণতি কোথায়!

সে আজ ত্রিশ বৎসরের আগের কথা। তখন ৯১ নং অপার সারকুলার রোডে একটী ছোট্ট অন্ধকার ঘরে ডাক্তার রায় তাঁর সাধের কারখানা বসিয়েছেন। তাঁর ভাষায় বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়:— "The Bengal Chemical & Pharmaceutical Works had its birth and early struggles in the dark and dingy rooms of a house in Upper Circular Road, and it

started with the modest sum of Rs. 800."—
অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্ম হয়েছে আপার সারকুলার রোডে একটী ছোট ময়লা ঘরে, সেখানেই সে তার প্রথম যুগের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাটিয়েছে। আর এটী আরম্ভ হয়েছিল সামান্য আটশ' টাকা নিয়ে।—তাঁর সম্বল দু'হাজার বিশ হাজার নয়, মাত্র আটশ' টাকা। এই সামান্য ৮০০ টাকা নিয়ে ডাক্তার রায় আর তাঁর এক বন্ধু সাহসে বুক বেঁধে কাজ আরম্ভ করেন। আর আমরা প্রায়ই দুঃখ করি মূলধন নেই, সুতরাং ব্যবসা করব কি রকমে। এখানে কিন্তু আমরা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কি দেখি? ডাক্তার রায়ের মূলধনও খুব সামান্য ছিল, তিনি কোন বড়লোককে টাকার জন্য ধরেন নি, কারও সুপারিশও চান নি। ভরসার মধ্যে তাঁর ছিল কেবল ২৫০৲ মাহিনা, আর মনের সাহস। সেইজন্যেই বল্‌তে হয় মূলধন নাই, এটী কেবল ছলমাত্র। আমাদের দরকার কঠোর সাধনা, চরিত্রের দৃঢ়তা আর আত্মত্যাগ। ডাক্তার রায়ের এগুলি জীবন্তভাবে আছে বলেই তিনি জীবনে এরূপ আশ্চর্য্য উন্নতি করতে পেরেছেন—আর সকলে অবাক্ হয়ে চেয়ে আছে।

এই মূলধনের বিষয় নিয়ে একদিন ডাক্তার রায়ের সঙ্গে কথা হয়। তিনি বলেনঃ—"ধর, তোমাকে যদি

৫০০৲ দি, তবে কি তুমি সেই টাকাটাকে বাড়িয়ে হাজার দু'হাজারে দাঁড় করাতে পারবে ?"

"কেন পারব না ?"

"এই যে বল্লে কেন পারব না, that shows যে তুমি ব্যবসার কিছুই জান না। ব্যবসা কি মুখের কথা ? এই মাড়োয়ারীদের কথাই ধর। তারা যখন ব্যবসা আরম্ভ করে, তখন কোন মহাজনদের কাছ থেকে কাপড় নিয়ে সেই কাপড় ঘাড়ে করে' বেচতে বেরোয়। এই রকমে সামান্য অবস্থা থেকে আরম্ভ করে', কালে তারা লাখপতি, ক্রোড়পতি হয়। যেমন এটর্নী হতে গেলে ২।৫ বছর গ্রাজুয়েটকে তাদের কাছে শিক্ষানবিশী করতে হয়, সেই রকম ব্যবসা করতে হলেও প্রথম ২।৪ বছর হাতে কলমে কাজ শিখতে হয়। এই, আমার এক ছাত্রের কথা ধর। তিনি একজন M. Sc.—কিন্তু এসব কিছু না করে' দালালিতে ঢোকেন। তারপর পুরো ৭টী বছর শুধু হাতে-কলমে কাজ শেখেন। ৭ বছর struggle করবার পর তিনি এখন মোটর চড়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর মত বড় বাঙালী দালাল নেই বল্লেও চলে। সেইজন্যে বল্‌ছি মূলধনে কি হবে, আগে চাই শিক্ষা, একটী প্রকৃত training। সেই সাধনা না থাকলে কিছু হবে না।"

অপর জায়গায় তিনি বলেছেন :—

"এখন একটা Capital-এর (মূলধনের) কান্না শোনা যায়। কিন্তু পাশ-করা ছেলের পক্ষে এটা শোভা পায় না ; কারণ এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়ে রিসার্চ করছেন এমন কোন যুবককে দশহাজার টাকার তোড়া দিলে ছ'মাসে তা খরচ ক'রে আর দশহাজার টাকা ধার ক'রে বসবেন।"

(অন্নসমস্যা)

একবার একটী লোক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন—"এত বড় কারখানা কি রকমে আপনি গড়ে তুল্‌লেন ?" এর উত্তরে তিনি সহাস্যে বল্লেন—"এ কি আমার কাজ, এ যে আল্লা গড়েছেন !" এ উত্তরের মধ্যে আমরা তাঁর বিনয়ের পরিচয় পাই, কিন্তু এর বদলে ডাক্তার রায়ের বলা উচিত ছিল—"একমাত্র একনিষ্ঠতার দ্বারা।"

সুখের বিষয় ডাক্তার রায় প্রথম থেকেই গুটীকতক নীরব কর্ম্মীর সাহায্য পান। বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার উন্নতির মূলে যেমন ডাক্তার রায়ের উৎসাহ আর অধ্যবসায় আছে, তেমনি তাঁর সাহায্যকারীদের আত্মত্যাগের পরিচয় আছে। ডাক্তার অমূল্যচরণ বসুই প্রথম তাঁর সাহায্যে আসেন। প্রথম অবস্থায় তাঁর সাহায্য না পেলে, আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের কি অবস্থা হত বলা যায় না। পরে

সতীশচন্দ্র সিংহ নামে এক কর্ম্মঠ যুবা এম-এ পাশ করে' তাঁর সাহায্যে আসেন। এঁকে আমরা বিজ্ঞানের কাজে martyr বল্‌তে পারি, কেন না সত্য সত্যই তিনি দেশের কাজে তাঁর অমূল্য জীবনটা উৎসর্গ করেছিলেন। একদিন ভুলক্রমে হাতে প্রুসিক এসিড ঢেলে ফেলেন, তাতেই তিনি অকালে মারা যান। আরও একজন নীরব কর্ম্মী এই কারখানায় এসে যোগ দেন, তিনি অধ্যাপক চন্দ্র-ভূষণ ভাদুড়ী। যদিও তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে Demonstrator থেকে জীবন আরম্ভ করেন, তবু তাঁর অসামান্য প্রতিভা ব্যবসা-ক্ষেত্রেও বিকাশলাভ করেছিল। তাঁরই অশেষ চেষ্টায় আজ বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর এত উন্নতি।

প্রথম অবস্থায় ডাক্তার রায়কে অনেক বাধা বিপত্তির সঙ্গে বীরের মত যুদ্ধ করতে হয়েছিল। সেই কথা ডাক্তার রায় বলেচেন—"২৭।২৮ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি, তখন কুলীর মত খেটে-ছিলাম। কয়েক বৎসরের মাহিনা থেকে ৮০০৲ টাকা জমিয়ে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' আরম্ভ করি—আজ তার মূলধন ২৫।২৬ লক্ষ টাকা।" সে সময় কারও সাহায্য পাওয়া দূরে থাক, একটা সামান্য উৎসাহ-বাক্যও শুনতে পেতেন

না। ডাক্তার রায় নিজেই বলেছেন :—"তখন সারাদিন আমাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হত, নিজেদের সুখ ও স্বাস্থ্যের দিকে একটুও নজর দেবার অবকাশ থাকত না। আর আমাদের সময় কারও কাছ থেকে কোনরকম উৎসাহ পাবার সুবিধা ছিল না—বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে কেউ কখনও উৎসাহ দিত না। এখন অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে—এ-বছর আমাদেরই কারখানার একজন বৈজ্ঞানিক এক লাখ টাকা কেবল রয়েলটী হিসাবে পেয়েছেন। তিনি আগুন নেবাবার একটা যন্ত্র (Fire Extinguisher) নতুনভাবে তৈরি করেছেন, এই Fire King গবর্ণমেণ্ট বেশী পরিমাণে নেওয়াতে আমরা তাঁকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিয়ে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান রাখতে পেরেছি। আমাদের সময় কোনও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন হয় নি। তখনকার কালে এ-সব স্বপ্ন-কথা মাত্র।"

এখন যোয়ান বা অন্য কোন জিনিষ দরকার হলে, তাঁরা একেবারে ৫০।১০০ মণ আনেন, কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন কোম্পানী একেবারে ছয় আনার বেশী যোয়ান আনতেন না। এই কোম্পানীর কাগজ-পত্রে তার রসিদ এখনও আছে। এই রকমে সামান্য অবস্থা থেকে বেঙ্গল

কেমিক্যাল জগতে শ্রেষ্ঠ কারখানা বলে' খ্যাতি লাভ করেছে। এর মূলে কেবল আত্মত্যাগ আর অধ্যবসায়। আমাদের দেশে যাঁরা নতুন ব্যবসায় বাণিজ্যে মন দিচ্ছেন, তাঁরা যেন ভাল করে' এই কথাটা মনে রাখেন—নচেৎ সাফল্য তাঁদের কখনও বরণ করে নেবে না। সেই কথার ওপর জোর দিয়ে ডাক্তার রায় বলেছেন :—"এদেশে নব্য-যুবকগণ বহু অর্থ ও চশমা, চুরুট, চেন লইয়া বাজারে অবতীর্ণ হন। এই সকল যুবক দুগ্ধফেননিভ শয্যায় লালিত পালিত, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধুর কখনও বা নবপরিণীতা ভার্য্যার স্নেহরসে সিক্ত ও পরিবর্দ্ধিত। এই সুখময় কল্পনার জীবন হইতে সহসা সংসারের কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, উহারা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকে, কৃত্রিম বন্ধু ও ব্যবসায়ীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শীঘ্রই বাইবেলে উক্ত যুবকের ন্যায় (Prodigal son) পিতার চরণে উপস্থিত হয়।" তাই বল্‌তে হয় যাঁরা প্রথম ব্যবসা-ক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌বেন, তাঁরা যেন সামান্য অবস্থা থেকেই আরম্ভ করেন, প্রথমেই যেন আড়ম্বর করে' না বসেন।

নতুন কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে ডাক্তার রায় নানা রকম দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতে মন দেন। নানা জায়গা থেকে নানা রকমের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে', সেগুলি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পেষণ

করে’ ঔষধ তৈয়ার হতে লাগল। এই সব ঔষধ লোকে প্রথমে ব্যবহার করতে ইতস্ততঃ করতে লাগল—কিন্তু ক্রমে এ-সব ঔষধের গুণ দেখে লোকে সাদরে ব্যবহার করতে থাকল। এই রকমে ডাক্তার রায় দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীকে জাগিয়ে তোলেন—এইখানে ডাক্তার রায়ের কৃতিত্ব। আরও দু’একটা ব্যাপারে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্ব বেশ বুঝা যায়। যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল Electric Supply Corporation-এর কাছে ইলেক্‌ট্রিক পাখার জন্য আবেদন করেন, তখন তাঁদের আবেদন গ্রাহ্য হল না। তখন তাঁরা ইলেক্‌ট্রিক Corporation-এর সাহায্য না নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে নতুন ধরণের পাখা আবিষ্কার করেন, যেটা চালাবার জন্যে বিদ্যুতের কোন দরকার হয় না, অথচ ইচ্ছামত যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যাওয়া যায়।

এইরূপে ডাক্তার রায়ের অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার গুণে আজ বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাঁর চেষ্টা কেবল কিসে কারখানার যশ আর সুনাম দেশের ও দশের কাছে বজায় থাকে। সেইজন্যে তিনি নিজহাতে সব কর্ম্মচারীদের তৈরী করেছেন। কোম্পানীর ম্যানেজার রাজশেখর বসু ডাক্তার রায়েরই ছাত্র। তাঁরই শিক্ষার গুণে তিনি আজ

এত বড় কারখানা চালাতে পারছেন। আর যে সকল রাসায়নিক এই কারখানায় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই ডাক্তার রায়ের ছাত্র—এম, এস-সি পাশ করে' এই দেশী কারবারে যোগ দিয়েছেন। একবার বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানায় সিরাপ তৈয়ার করবার সময় Formula কি ভুল হয়ে যায়। তা'তে সিরাপ খারাপ হয়ে যায়, প্রায় ১৫০।২০০ বোতল সিরাপ একটু নষ্ট হয়ে যায়। তখন কথা উঠল—এখন কি করা যায়? কোন কোন রাসায়নিক বল্লেন :—"এতে আর কি হবে? এই সিরাপই থাকুক—বাজারে চলে' যাবেখন।" ডাক্তার রায় এতে রাজী হলেন না, বল্লেন—"দেখুন, এ সামান্য ক'টা টাকার চেয়ে বেঙ্গল কেমিক্যালের সুনামের দাম অনেক বেশী। এই খারাপ জিনিষের দরুণ যদি বাজারে একবার আমাদের নাম খারাপ হয়ে যায়, তবে সে নাম ফিরে লাভ করতে অনেক দিন যাবে।" তখন তিনি নিজে দাঁড়িয়ে সেই সব সিরাপ ফেলে দিলেন। তাই বলতে হয় বেঙ্গল কেমিক্যালের বাজারে আজ যে এত সুনাম তার মূলে ডাক্তার রায়ের সততা।

যখন ডাক্তার রায় দেখলেন যে, কারবারে বেশ লাভ হচ্ছে—তখন লাভের অংশ কেবল নিজে না নিয়ে, যাতে

এটী দেশের সাধারণের সম্পত্তি হয়, সেজন্য এটীকে "লিমিটেড" কোম্পানীতে পরিণত করেন। সেই সময় স্যার রাসবিহারী ঘোষ, ডাক্তার চুনীলাল বসু প্রভৃতি পরিচালকরূপে এই কারবারে যোগ দেন। কোম্পানীর মূলধন তখন পাঁচলক্ষ টাকা, এখন এটা আরও বাড়ান হয়েছে। কোম্পানীর অফিস আগে ছিল সার্কুলার রোডে, এখন আছে কলেজ স্কোয়ারে—আর প্রকাণ্ড কারখানা হয়েছে মাণিকতলায়—১১ বিঘা জমির উপর। আজকাল কাজ এত বেড়ে গেছে যে, তাতেও জায়গার সংকুলান হচ্ছে না, তাই পাণিহাটিতে নতুন কারখানা খোলবার প্রস্তাব চলছে—সেখানে কারখানা তৈয়ার করতে বিস্তৃত জমি নেওয়া হয়েছে, কারখানা তৈরি আরম্ভও হয়েছে।

কারখানার ব্যবস্থা অতি চমৎকার। এখানকার সুন্দর ব্যবস্থা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁর সহযোগীদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছে। সারা জগতে এখন অর্থ (Capital) ও দৈহিক পরিশ্রমের (I...bour) মধ্যে ভীষণ বিরোধ চলছে। তার ঢেউ যে ভারতেও এসে পৌঁচেছে তা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বেশ বুঝতে পেরেছেন, তাই প্রথম থেকেই তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সুখ আর স্বচ্ছন্দতার দিকে তিনি নজর রেখেছেন। তাঁর কারখানায় মোট ২।৩

হাজার লোক কাজ করে—আশ্চর্য্যের বিষয় তাদের মধ্যে কেউই কোম্পানীর উপর বিরক্ত নয়। কেন না, কোম্পানী থেকে তাদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের রীতিমত বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কারখানার চারদিকে তাদের জন্যে বসতবাটী নির্ম্মাণ করা হয়েছে। যারা লেখাপড়া জানে না, তাদের শিক্ষার জন্যে "নৈশ বিদ্যালয়" আছে। যাতে কর্ম্মচারীরা সঞ্চয় করতে ও সমবায়ের মূল্য বুঝতে পারে, সেজন্য "সমবায় সমিতি"ও আছে। সকল কর্ম্ম-চারীই এই সমিতির সভ্য।

এ কারখানা এখন বাঙালীর গৌরবস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখন স্বদেশীর বন্যায় দেশ ভেসে গেছল, তখন দেখতে দেখতে দেশে অনেকগুলো কল কারখানা দেখা দেয়। কিন্তু ক'টা কালের প্রভাব সহ্য করতে পেরেছে? একে একে অনেক কারবার, অনেক কার-খানাই লোপ পেল। ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স, স্বদেশী ষ্টোর্স ত সেদিনের কথা। কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালের সৃষ্টি স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে—তবুও এখনও সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আর বাঙালীর গৌরব বলে' পরিচয় দিচ্ছে। এর মূলে কেবল স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভা ও অধ্যবসায়।

নিজে ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রবেশ করে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভাল করে বুঝেছেন যে, যতদিন না বাঙালী জাতি চাকরীর মোহ ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হচ্ছে, ততদিন এ-জাতির উন্নতির কোন আশা নেই, ততদিন এর ভবিষ্যৎ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাবে। আর সেই কারণে তিনি তাঁর সাধের বৈজ্ঞানিক গবেষণার লোভ ছেড়ে বাংলার ভবিষ্যতের আশা ভরসা যুবকদের আহ্বান করছেন ব্যবসায়ে যোগ দেবার জন্যে। সে চেষ্টা আজ তিনি নতুন একটা উত্তেজনার বশে করছেন না, অনেকদিন আগে থেকে বার বার বাঙালীর কানের কাছে সেই আহ্বান ধ্বনিত করছেন। সেই কথা স্পষ্ট করে বলবার জন্যে ১০।১২ বছর আগে তিনি তাঁর "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহারে" লিখেছিলেন :—"আশা করি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন পথভ্রান্ত বঙ্গদেশে স্বাধীন চিন্তার ও সত্যানুরাগের নির্ম্মল স্রোত আসিয়াছে, বঙ্গীয় যুবক জাগ্রত হইতেছে ; জঘন্য দাসত্বের পরিবর্ত্তে কোন কোন কর্ম্মকুশল যুবক ব্যবসা ও বাণিজ্যে ধনাগমের পথ প্রদর্শন করিবে ও কল-কারখানা স্থাপন করিবে।"

এই একই কথা নতুনভাবে বাঙালী যুবককে আবার শুনাতে বর্ত্তমানে তিনি "অন্নসমস্যা" দশের সামনে উপস্থিত

করেছেন। যে সমস্যা আজ বাঙালীকে জীবনযুদ্ধে জয়মাল্য ধারণ করতে দিচ্ছে না, সেই সমস্যার মীমাংসা করতে তিনি চাইছেন। তাই বাংলার লোকদের ডেকে তিনি বলছেন :—

"আমাদের এখন উঠে পড়ে লাগতে হবে, এই ভয়ঙ্কর অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে হবে। যে শিক্ষায় শুধু মেরুদণ্ডহীন গ্রাজুয়েট তৈরী হয়, মনুষ্যত্বের সঙ্গে পরিচয় হয় না, যে শিক্ষা আমাদের 'করে' খেতে' শেখায় না, দুর্ব্বল অসহায় শিশুর মত সংসারপথে ছেড়ে দেয়, সে শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাই আমি জীবনে কঠোরতার আশ্রয় নিয়ে বাঙালী যুবককে ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা করতে আহ্বান করছি; কারণ, বাঁচতে হলে বাঙালীকে আগে অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে হবে।"
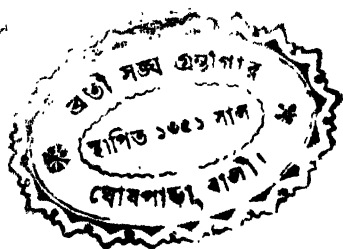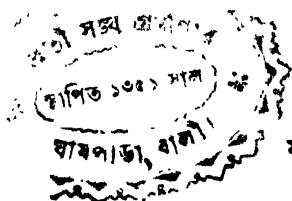
ষষ্ঠ অধ্যায়

বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিদর্শন

অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল যে ডাক্তার রায়ের প্রধান কীর্ত্তি বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা দেখতে যাব। সৌভাগ্য ক্রমে যাবার সুযোগও ঘটল—শ্রীযুক্ত শশধর রায়ের কাছে আমরা ইচ্ছা জানাবামাত্র, তিনি আনন্দের সঙ্গে ডাক্তার রায়ের নামে চিঠি দিলেন। যদিও এর আগে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দু' এক বার দেখা হয়েছিল, তবু ভরসা হল না নিজে সরাসর গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করতে। চিঠি নিয়ে একেবারে Science College-এ গেলাম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রসন্নবদনে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, বল্লেন—"বেশ ত, কারখানা দেখতে যাবে, সে ত ভাল কথা। এই আমি লিখে দিচ্ছি Factory Superintendent-এর কাছে, নিয়ে যাও, তিনি সব ভাল করে দেখাবেন।" এই বলে তিনি কারখানার অধ্যক্ষের নামে একখানা চিঠি দিলেন। দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"আর সঙ্গে কে যাবে?"

আমি উত্তর করলাম—"আমি যাব, আর মিষ্টার মরীনো যাবেন।"

তিনি বল্লেন—"ওঃ, মিষ্টার মরীনো! তাকে যে আমি খুব চিনি। তিনি আরমেনিয়ান না?"

আমি বল্‌লাম—"না, তিনি Anglo-Indian, তবে Armenian কলেজের অধ্যক্ষ বটে।"

তিনি ফের বল্লেন—"তাঁর বুঝি এ-সব দিকে ঝোঁক আছে?"

আমি উত্তর দিলাম—"হাঁ, তিনি কারখানা দেখবার জন্যে উৎসুক হয়েছেন।"

তারপর মিষ্টার মরীনোর সঙ্গে আমি কারখানা দেখবার জন্যে একখানা গাড়ী করে যাত্রা করলাম। আগে কখনও সে কারখানায় যাইনি, তবে ঠিকানা জানতাম—মাণিকতলা মেন্ রোড। রাস্তা ঠিক জানা ছিল না, তাই একটু বেরাস্তায় গিয়ে পড়লুম। শেষে জিজ্ঞাসা করে করে কারখানায় হাজির হলুম। সেখানে পৌঁছতে কারখানার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা হল। ডাক্তার রায়ের চিঠি দেখাতে, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, আর একজন কর্ম্মচারীকে আমাদের কারখানা দেখাবার জন্যে অনুরোধ করলেন।

কর্ম্মচারীটি আমাদের পথ-প্রদর্শক হয়ে ঘুরে ঘুরে কারখানাটি দেখালেন। প্রথমেই চোখে পড়ল—কর্ম্মচারীদের

থাকবার জন্যে পাকা বাড়ী। কর্ম্মচারীদের সুখের দিকে যে কোম্পানীর দৃষ্টি আছে তা বেশ বোঝা গেল। অন্য কোম্পানীদের মত এঁরা কর্ম্মচারীদের ছোট বা হেয় ভাবে দেখেন না—তাই তাদের সুখের জন্য টাকা খরচ করতে কাতর হন নি। এঁরা জানেন যে কোম্পানীর লাভ বা লোকসান নির্ভর করে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের উপর। যদি তারা কোম্পানীর জন্যে প্রাণপণে খাটে তবেই ত কোম্পানীর উন্নতি। আর সেই কারণে কোম্পানীরও দেখা দরকার কিসে তার অধীন লোকদের দুঃখ কষ্ট দূর হয়। সেই সব পাকা বাড়ীতে কারখানার অধ্যক্ষ থেকে সামান্য কর্ম্মচারীর থাকবার বন্দোবস্ত আছে। বাড়ীগুলি বেশ সুন্দর, আর থাকবার বন্দোবস্তও প্রশংসনীয়।

সেই বাড়ীগুলি দেখতে দেখতে ডাক্তার রায়ের একটা কথা মনে হল। তিনি একদিন বলেছিলেন—“দেখ, বাঙালী ব্যবসার ক্ষেত্রে নেবেছে বটে, কিন্তু একটা বিষম দোষ তারা এড়াতে পা৷র নি। সেটা হচ্ছে—লোভ, তারা চায় যাতে সব লাভটা তারাই ভোগ করে, আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের জন্যে খাটছে, যাদের জন্যেই তাদের এত লাভ, তাদের একেবারে বাদ দিতে

চায়। সেইটেই ভারি অন্যায়। তাদের উচিত—কর্ম্মচারীদের পরিশ্রমের জন্যে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া। তাতে কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট হয়—আর কোম্পানীরও লাভ হয়।" এখানে আমরা নিজের চক্ষে দেখলাম—কিরূপে সেই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত হয়েছে।

তার পরেই দেখলাম—এক প্রকাণ্ড ছাপাখানা। দেখেই একটু আশ্চর্য্য হলাম—ওষুধের কারখানায় ছাপাখানার কি দরকার? সেখানে দেখলাম—ওষুধের নানা রকম লেবেল, ওষুধের তালিকা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছাপা হচ্ছে। যদি এই কাজ বাইরের কোন প্রেসে দেওয়া হত, তা হলে খরচ ত খুব বেশী হতই, তা ছাড়া কাজ এত ভাল হত না, এত কম সময়ের মধ্যে দরকার মত কাজও পাওয়া যেত না। তাই এ সব অসুবিধা দূর করবার জন্যে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এখানে ৩।৪টা বড় ছাপার মেসিন আছে, তার জন্যে প্রিণ্টার, কম্পোজিটার আর মেশিনম্যান আছে। তা'ছাড়া দপ্তরী আছে, ব্লক করবার জন্যে আলাদা লোক আছে—যাতে সব কাজ নিজেদের মধ্যে হতে পারে। একইরকম লেবেল বা ফর্ম্ম্ বার বার ছাপতে হয় বলে—এখানে ষ্টিরিওটাইপের ভাল বন্দোবস্ত আছে। এঁরা বিজ্ঞাপনের উপকারিতা

বোঝেন—তাই বিজ্ঞাপন যাতে সাধারণ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইজন্যে বেশ সুন্দরভাবে বিজ্ঞাপনগুলি ছাপা হয়। বিজ্ঞাপন যে ব্যবসার প্রসারের একমাত্র উপায় সে কথা এঁরা ভাল করে জানেন, তাই বিস্তৃতভাবে বিজ্ঞাপন দেবার জন্য অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন না। আবার কাগজে বা মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন লেখার জন্যে আলাদা আর্টিষ্ট ও লেখক আছেন।

এ-সব দেখা হলে পথ-প্রদর্শক আমাদের ঔষধের ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখি, এক ঘরে হয় ত দেশী পাচন তৈরি হচ্চে, অপর ঘরে হয় ত নানারকম ট্যাবলেট তৈরি হচ্ছে। এ-সব ব্যাপার তিনি বেশ সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে লাগলেন। যদি না তাঁর সাহায্য পেতাম, হয় ত সব ব্যাপারের মানে বুঝতে পারতাম না। এক ঘরে ত ঔষধ প্রস্তুত হতে লাগল—আবার অন্য ঘরে দেখা হল ঔষধ ঠিক হয়েছে কি না। তারপর ঔষধ মোড়বার জন্যে সেগুলি প্যাকিং ঘরে পাঠান হয়—সেখানে অনেক লোক বসে বসে কেবল ওষুধ প্যাক করছেন।

তারপর তিনি Power House (বৈদ্যুতিক শক্তির ঘর) দেখালেন—সে এক প্রকাণ্ড ব্যাপার। কারখানার নানারকম যন্ত্র চালাবার জন্যে যে বিদ্যুৎ দরকার হয় তার

উদ্ভব এইখানেই হচ্ছে। এইখান থেকেই বিদ্যুৎ গিয়ে ছাপাখানার মেসিন চালাচ্ছে—আবার অন্য জায়গায় বড় বড় কাঠ চেরবার জন্যে করাতও চালাচ্ছে।

যন্ত্রের ঘরে গিয়ে দেখি, কত রকম ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরি হচ্ছে আমাদের দেশী কারীগরের দ্বারা। এই ওয়ার্কসপের আরম্ভ হয় সামান্য অবস্থা থেকে। তখন মাত্র দু' চারটি কল নিয়ে কাজ আরম্ভ হয় এবং নিজেদের দরকার মত যন্ত্রাদি প্রথমে তৈরী হত, ক্রমে ওয়ার্কসপের কাজ এত বেড়ে গেছে যে অনেকগুলি কারিগরের দরকার হয়েছে এটি চালাবার জন্যে। এই কারখানা কলেজের ল্যাবরেটরী সাজাবার কাজে এমন দক্ষতা লাভ করেছে যে ভারতের সবদেশের কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এঁদের ডেকে পাঠান্ ল্যাবরেটরী সাজাবার জন্যে।

এখানকার এসিড্ ঘর দু'টি দর্শনীয়। অনেকের ধারণা ছিল যে বিলাত থেকে দক্ষ লোক না আনালে এখানে সীসার এসিড ঘর কখনও তৈরী হতে পারে না, কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যাল অসম্ভবও সম্ভব করেছেন। এই সীসার ঘর তৈরী করবার জন্যে তাঁদের নতুন কারিগর হাতে করে গড়তে হয়েছে। সেই দেশী 'লেড্ম্যান' আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে এই সীসার ঘর তৈরী করেছে। এই সীসার

ঘরের কাজ দিন রাত হয়—আর রোজ চার হাজার পাউণ্ড এসিড তৈরী হয়।

এখানকার আবিষ্কারের মধ্যে দুটি জিনিষ খুব উল্লেখ-যোগ্য দেখলাম। একটি দেশী পাখা—এ পাখা বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য না নিয়েই চলে। এবং নীচে যে কেরা-সিনের বাতি আছে সেটি জ্বেলে দিলেই পাখা ঘুরতে আরম্ভ করে এবং বেশ বাতাস হয়। সেই জন্যে মফঃস্বলে এর বেশী আদর—যেখানে বিদ্যুত পাওয়া কঠিন।

আর একটি "ফায়ার কিং"—আগুন নিবাবার যন্ত্র এবং এর আবিষ্কারক বাঙালী। যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হয়ে বহু সংখ্যক "ফায়ার কিং" নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন অনেক কারখানায়, বায়স্কোপে এর প্রচলন দেখা যায়।

১৯১৪ সালে যে জর্ম্মণ-যুদ্ধ আরম্ভ হয় তাতে বিদেশী রাসায়নিক মালের আমদানী কমে যায়, কারণ আগে একা জার্ম্মণীই পৃথিবীকে সবচেয়ে বেশী মাল দিচ্ছিল। তখন অভাবে পড়ে বেঙ্গল কেমিক্যালকে সেই সব জিনিষ ভারতে তৈরী করতে হল। তাই অনেকে বলেন যে যুদ্ধের সময় বেঙ্গল কেমিক্যাল না থাকলে ওযুধের বাজারের অবস্থা শোচনীয় হত।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার রায় বলেছেন—"বর্ত্তমান যুদ্ধের নানা কুফলের মধ্যে—একটা সুফল এই ফলিয়াছে যে বিলাতী মাল বেশী আসিতে না পারায় আমাদের দেশের কল-কারখানাগুলি অধিক লাভে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিতেছে। স্বদেশী কারখানার মধ্যে কাপড়ের কল, চর্ম্ম পরিষ্কারের কারখানা, টাটার লৌহ কারখানা, বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মত রাসায়নিক কারখানা প্রভৃতি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং যে সকল জিনিষ পূর্ব্বে এদেশে প্রস্তুত হইত না তাহার মধ্যে কিছু কিছু এক্ষণে এদেশেই প্রস্তুত হইতেছে।"

যুদ্ধের সময় গবর্ণমেণ্টের অনেক পরিমাণে এসিড ও কেমিক্যাল দরকার হয়েছিল। তার বেশীভাগ জিনিষ বেঙ্গল ক্যমিক্যাল সরবরাহ করেছিল। সেই জন্যে কোম্পানীর কাজ নানা বিভাগে বেশীরকম বেড়ে গেছে। এখন কোম্পানী রোজ চার-পাঁচ টন Sulphuric Acid, আধ টন Thiosulphate of Soda, বহু পরিমাণে Magnesium Sulphate, Alum ও Bichromates তৈরি করছেন। Munition Board এ বহু পরিমাণে যুদ্ধের দরকারী জিনিষ দেওয়াতে গবর্ণমেণ্টের খুব সাহায্য হয়েছিল। গবর্ণমেণ্ট সেই সাহায্যের ঋণ স্বীকার স্বরূপ ও

বিজ্ঞানের রাজ্যে তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তির জন্যে ডাক্তার রায়কে "স্যার" উপাধি দিয়েছিলেন।

এই কারখানা সম্বন্ধে একখানি বিলাতী কাগজ (The Indian and Eastern Druggist, Jan. 1921) বলেছেন—"The Bengal Chemical and Pharmaceutical Works are probably the largest of their kind in India, and they are a lasting monument to the genius and industry of their founder, who recounted with justifiable pride that the Company employs about 1200 men, and has on its technical staff some thirty expert chemists, all of whom hold the qualification of Bachelor or Master of Science." অর্থাৎ—বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা বোধহয় ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বড় কারখানা। এটি এর স্থাপয়িতার প্রতিভা ও পরিশ্রমের চিরস্থায়ী স্মৃতিমন্দির। তিনি মার্জ্জনীয় গর্ব্বের সঙ্গে বলেছেন যে এই কোম্পানী ১২০০ লোক খাটায় এবং ৩০ জন দক্ষ রাসায়নিক এখানে কাজ করেন যাঁরা হয় বি, এস-সি, নয় এম, এস-সি।

সম্প্রতি বিলাতের Times পত্র ডাক্তার রায়ের কারখানা সম্বন্ধে বলেছেন—

"Nearly 30 years ago, he founded the Bengal Chemical & Pharmaceutical Works, which has grown into a large concern and has done much to develop manufacture and to popularise the use of India's indigenous drugs. Some 1200 men are employed and the technical staff includes some 30 expert chemists, all of whom hold the qualification of a science degree. Sir Prafulla has also been associated with such industrial developments as the Bengal Potteries, the Calcutta Soap Works, the Bengal Canning and Condiment Works, as well as several other Indian managed concerns."

যখন আমরা চারিদিক তন্ন তন্ন করে দেখে ফিরে এলাম তখন ভাবলাম যে এ কথাগুলো কতদূর সত্য। এত প্রকাণ্ড কারখানা যে কেবল বাংলার বা বাঙালীর গৌরব তা নয়—এ সারা ভারতের এবং সমস্ত ভারতবাসীর গৌরবস্থল।

সপ্তম অধ্যায়

হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস

ইতিহাস ডাক্তার রায়ের বড়ই প্রিয়। তিনি ইতিহাস পড়তে খুব ভালবাসেন। যদিও তিনি রাসায়নিক তা হলেও, তাঁর অনেক সময় ইতিহাস আলোচনা করতে কেটেছে। ইতিহাসের ভক্ত বলেই তিনি এমন একখানা বই লিখেছেন—যা চিরদিন তাঁর নাম অমর করে রাখবে। সেখানি—তাঁর হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস। ভারতেও যে এককালে রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা হত, তার পরিচয় তিনি এই বইতে দিয়েছেন—আবার কি করে ভারতে সেই বিদ্যার লোপ হল তারও ইতিহাস এই বইতে পাওয়া যায়।

এ বই লেখার ইতিহাস তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছেন। তিনি মেদিনীপুরে এ-সম্বন্ধে বলেছিলেন—"পৃথিবীর প্রাচীন জাতিরা রসায়নশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী হয়েছিলেন তাহা অবগত হইতে আমার চিরকাল কৌতূহল আছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এডিন্‌বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন হইতে টমসন, কপ্‌ প্রভৃতি মনীষিগণের বিখ্যাত গ্রন্থ সমূহ আমার প্রিয় সঙ্গী ছিল। সেই সময় ভারতবাসীগণ রসায়নশাস্ত্রে

কিরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তাহা জানিবার জন্য আমার মনে স্বতঃই অনুসন্ধান করিবার স্পৃহা জাগরুক হয়। এই নিমিত্তই আমি 'চরক', 'সুশ্রুত' প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের যে সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থ কালের কবলে অবলুপ্ত হয় নাই, তাহা লইয়া রাসায়নিকের দিক্ হইতে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই।"

এইবার রসায়নশাস্ত্রে গবেষণা ছেড়ে তিনি ইতিহাসের রাজ্যে উৎসাহের সঙ্গে গবেষণা আরম্ভ করলেন। এতে তাঁর মন এত বেশী ঐতিহাসিক গবেষণায় মত্ত হয়ে পড়ল যে, তাঁর ল্যাবরেটরীর কাজের ভয়ানক ক্ষতি হতে লাগল —কিন্তু তবু সে ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি গবেষণায় ব্যস্ত রইলেন। তার পর এ ব্যাপারে তিনি কোথা থেকে কি রকমে সাহায্য পান সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন— "এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রায় একুশ বৎসর পূর্ব্বে আমি মসিয় বার্থেলোর সংশ্রবে আসি। এই ঘটনা আমার ঐতিহাসিক রসায়নশাস্ত্র পাঠের পথনির্দ্দেশক স্বরূপ। যিনি প্রতীচ্য জগতের রসায়নশাস্ত্রের কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল ও কোন্ স্থান হইতে তত্রত্য লোকেরা ঐ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল তাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, সেই তৎকালীন

রসায়নিকদিগের অধিনেতা জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক হিন্দুগণ রসায়ন শাস্ত্রে কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছিল তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। এমন কি তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এই সংকল্পে প্রণোদিত হইয়া আমি "রসেন্দ্রসার সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রেরণ করি। পরে দেখিতে পাই যে, ঐ গ্রন্থের কোন বিশেষত্ব নাই, কারণ উহা দ্বারা হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের উৎপত্তির হেতু অবগত হওয়া যায় না। বার্থোলো যে ঐ প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার "মধ্যযুগে রসায়ন শাস্ত্র" নামক তিন খণ্ড বিশাল গ্রন্থ আমাকে উপহার পাঠাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ প্রধানতঃ আরব ও সিরীয় গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত। আমি কিন্তু তখনও উহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিলাম না। উহা অধ্যয়ন করিবার পর হিন্দু রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে একখণ্ড পুস্তক লিখিয়া ঐ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ করিবার উচ্চ আশা আমার মনে উদিত হয়"

এই রকমে তিনি হিন্দু রসায়ন-শাস্ত্রের ইতিহাস লিখতে

মনস্থ করেন। কিন্তু কাজ আরম্ভ করে' দেখেন যে কাজে কত বাধা-বিঘ্ন। সে কথা তিনি নিজে বলেছেন—"যখন আমি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম, তখন আমার মনে নানা দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করি। কারণ আমার ভয় হইয়াছিল যে তথ্যগুলি বুঝি অতি সামান্য ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। যাহা হউক আমি পূর্ণ উদ্যমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই পুরাতন কীটদষ্ট রসায়নশাস্ত্রের পুঁথির প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

"মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, আনোওয়ার, বারাণসী, কাটামুণ্ডু (নেপাল) প্রভৃতি স্থান হইতে ঐ সকল পুঁথি আসিতে লাগিল। এমন কি তিব্বত হইতেও তেঙ্গুর নামে এক বহুমূল্য গ্রন্থ পাইয়াছিলাম। ১৯০৪।৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন লাসা কিছুদিনের জন্য ইংরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, সেই সময় ভারতীয় সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ক ঐ গ্রন্থ এই দেশে আসে।"

এই অমূল্য বইখানি তিব্বত থেকে পাওয়াতে ডাক্তার রায়ের গবেষণার অনেক সুবিধা হল। বার বছর ধরে যে গবেষণায় মত্ত রয়েছেন—সেই গবেষণা যে ক্রমশঃ শেষ হয়ে আস্ছে—এই ভেবে তিনি বড়ই খুসী হয়েছিলেন।

তাই . তনি নিজেই বলেছেন :—"বহুবর্ষ নিষ্ফল চেষ্টার পর রত্নান্বেষী দৈবাৎ এক বহুমূল্য ধাতুর খনি আবিষ্কার করিলে, তাহার মনে যেরূপ আনন্দের উদ্রেক হয়, আমিও সেইরূপ আনন্দে আত্মহারা হইলাম। যদিও পুস্তকাগার ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যথোপযুক্ত সময় বণ্টন করিতে আমার অসুবিধা হইয়াছিল, তথাপি লুপ্ত রত্নরাজির আবিষ্কার আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশবর্ষকাল নিয়োজিত করিয়াছিল।"

দুই খণ্ডে এই প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখে ডাক্তার রায় যেমন একদিকে জগৎ সভায় বাঙালীর তথা ভারতের মান রাখলেন, তেমনি অন্যদিকে সেই সঙ্গে তাঁর নামও ঐতিহাসিক বলে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। সব সভ্যদেশের জ্ঞানীরা এই বই পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন যে যখন ২৫০০ বৎসর আগে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবক কোমার ভট্ট ঋষি আত্রেয়ের কাছে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করতেন, তখন ভারতে রসায়নবিজ্ঞানের খুব চর্চ্চা ছিল।

"হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" ডাক্তার রায়ের অমূল্য কীর্ত্তি। দেশে বিদেশে এই বইখানি সম্মান লাভ করেছে। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি এর যথোচিত প্রশংসা করেছেন।

সিলভাঁ লেভি বলেন :—

"The second volume which has just appeared brings to a close this important work. The author is Professor of the Presidency College, Calcutta ; his researches have won for him a legitimate fame. His laboratory is the nursery from which issue forth the young chemists of new India. Prof. Ray is also an excellent Sanskritist......moreover, he is familiar with the languages of the West and is quite at ease with works written in Latin, English, German and French.

(Journal Asiatique, 1907).

সম্প্রতি *Isis* বলে একখানি ক্রুসেলের বৈজ্ঞানিক কাগজ, তাঁর এই বই সম্বন্ধে বলেছেন :—"*Isis* is happy to welcome in this work not only one of the rare examples of serious critical study by a non-European savant on the history of science in his own country, but an important contribution to the history of universal science,

which is independent of the distinctions of language and race. Doctor of Science, for many years Professor of Chemistry at the Presidency College (Calcutta), the author unites all the conditions necessary to accomplish his task excellently, as he joins to scientific competency and a deep knowledge of history those natural affinities so useful to comprehension of doctrines which follow from the community of culture between the investigator and the theories which are the object of research. No work can, even from a long time past, in any domain of Indian science, compare with this extensive inquiry into the chemical theories for twenty centuries. If the undertaking required the testimony of an authority to guarantee its value, we should only recall with what sympathy the best judge in the matter, M. Berthelot, once gave an account of a memoir of Ray, which

was a prelude to this publication (Journal des Savants, April, 1898) and how he welcomed, a few years before his death, the first volume, saying that a new and interesting chapter had been added to the history of science and human progress.

অষ্টম অধ্যায়

দ্বিতীয় বার বিলাত যাত্রা

প্রথমবার আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন বিলাত যান, তখন তাঁকে দুঃসাহসের উপর নির্ভর করে যেতে হয়েছিল— অনেক ভবিষ্যতের চিন্তা, উদ্বেগ তাঁর মানসরাজ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত করেছিল। দ্বিতীয়বার যখন যান, তখন সে দুশ্চিন্তা তাঁকে ব্যস্ত করে নি, গবর্ণমেণ্টের খরচে তিনি গিয়েছিলেন। ইউরোপে যে সব প্রধান প্রধান বিদ্যাপীঠে যে সব শ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটারী ছিল সে-গুলি পরিদর্শন করবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে ১৯০৪ সালে সব বিশ্ববিদ্যালয় তন্ন তন্ন করে' দেখে বেড়ান। বিলাতের সব পরীক্ষাগার দেখে, তিনি ফ্রান্স, জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করতে যান।

তখন এ সব জায়গায় রাসায়নিক বলে তাঁর নাম খ্যাত হয়ে গেছে। তার আগে থেকে তিনি বিলাতের কেমিক্যাল সোসাইটীর পত্রিকাতে তাঁর গবেষণার ফল প্রচার করে আসছিলেন। তাই থেকে বিলাতের বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলী জানতে পেরেছিলেন যে কত বড় একজন রাসায়নিক তাঁদের

দেশে আসছেন। তাই বিলাতে, ফ্রান্সে সব জায়গায় তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ধূম পড়ে গেল।

ফরাসী দেশে French Academy তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করে' সভার সভ্যদের কাছে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দেন। তাতে লেখা ছিল—"Presence d'un savant estranger—Mr. President announce que Monsieur P. C. Ray, Professor de Chimic a Calcutta, auteur de travaux importants sur less les nitrites ainsi que dune Historie des Chemictes Hindous assiste a la seauce et ni souhaite la bienoene." (La Nature, 11 March, 1905) তাঁর পরিচয় দিতে, তাঁকে "হিন্দুরসায়নশাস্ত্রের ইতিহাসের" লেখক বলে উল্লেখ করেন।

ফরাসী দেশ থেকে তিনি ইউরোপের যে যে দেশে গেলেন, সেখানেই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

বিলাত থেকে ফিরে এসে ডাক্তার রায় পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছ থেকে এক ডাক পান। পঞ্চনদের পীঠস্থান তাঁকে ডেকে পাঠালেন রসায়নশাস্ত্রের সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য। এর আগে আর কোনও

ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে কোন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণামূলক বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন নি। এই প্রথম আহ্বান। এর পরে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা দিতে ডেকে পাঠান। বিশ্ববিদ্যালয় ডাক্তার রায়কে যে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন—তা তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন।

তৃতীয়বার বিলাত যাত্রা

এর পর পুনরায় ডাক্তার রায়কে বিলাত যেতে হয়েছিল। সে ১৯১২ সালে, তখন লণ্ডন সহরে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মিলন সভা বসেছিল। সে সভা থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেও নিমন্ত্রণ এসেছিল। সেই নিমন্ত্রণ রাখতে ডাক্তার রায় আর ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে তাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যথা নিয়মে কর্ত্তব্য পালন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:—"১৯১২ সালে Conference of the Empire Universitiesএ বলেছিলাম—তোমরা ভারতবর্ষের ডিগ্রীকে নগণ্য মনে কর,—কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক, কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্জন, কলিকাতার

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ, ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার, (যিনি তিনবার ঐ পদে মনোনীত হয়েছিলেন—এবং যিনি আর ইহ জগতে নেই !)—ইঁহারা সকলেই কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী !"

অনেক বড় বড় সভা সমিতি ডাক্তার রায়কে অভ্যর্থনা করেন। তাঁর বিজ্ঞান সম্বন্ধে নূতন নূতন গবেষণাতে মুগ্ধ হয়ে Durham বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর গুণের উপযুক্ত পূজা করতে কৃতসঙ্কল্প হন। সেই কারণে তাঁকে এক বিশেষ সভায় Honorary D. Sc. উপাধি দেন। Durham বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার তাঁকে "ডাক্তার" উপাধি দেবার সময় বলেন :—

"A keen and successful investigator, he (Dr. Ray) has long made his mark by contribution to scientific periodicals, both English and German, but his fame chiefly rests on his monumental *History of Hindu Chemistry*—a work of which both the scientific and linguistic attainments are equally remarkable, and of which, if of any book, we may pronounce that it is not defective."

তিনি যখন বাংলাদেশে ফিরে এলেন, তখন সরকার থেকে তাঁর গুণের আদর করবার আয়োজন হল। তাঁর নানা গুণের জন্য সরকার সেই সময় তাঁকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ডাক্তার রায়ের দৃষ্টি কিন্তু কোন উপাধি বিশেষের দিকে আকৃষ্ট ছিল না, তিনি কেবল তাঁর কর্ত্তব্য সাধন করে যাচ্ছিলেন—কখনও তার ফলাফলের জন্য পিছন ফিরে তাকান নি।

বিলাত থেকে ফেরবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরা মিলে তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভাতে অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব সভা-পতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি ডাক্তার রায়ের নানা গুণের প্রশংসা করে' বলেন :—

"ডাক্তার রায় বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন বলেই যে শুধু এ সভা আহূত হয়েছে তা নয়, এর তলায় আরও গভীর কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ যেটা সকলের কাছে বেশ পরিষ্কার রয়েছে সেটী এই যে, তাঁর দয়া, তাঁর বদান্যতা এবং ছাত্রসমাজের কাছে তাঁর সহৃদয়তার জন্য। আর এক কারণ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি যা করেছেন তার জন্য। ডাক্তার রায়ের বিজ্ঞানে গবেষণার পরিচয় দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে। কিন্তু চারটে বিষয় আমরা সহজেই

দেখতে পাই। প্রথম—তাঁর নতুন নতুন আবিষ্কার আর গবেষণা যার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে পূজ্য, দ্বিতীয় —তাঁর অমর গ্রন্থ—"হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস"—যে বইএর জোড়া এক্ষেত্রে একেবারেই নেই। তাঁর আর একটী স্মরণীয় কাজ—বেঙ্গল কেমিক্যাল স্থাপনা—যার উন্নতি নিশ্চিত ও যেটী দেশের পক্ষে বিশেষ দরকারী। আর একটী কাজ তাঁর আছে—যেটীকে আমি সবচেয়ে সেরা মনে করি। ডাক্তার রায় তাঁর ল্যাবরেটারীতে একদল কর্ম্মঠ যুবা বৈজ্ঞানিক তৈরী করছেন—যাঁরা তাঁর কাজটী চালাবেন। সেই জন্য একজন ফরাসী অধ্যাপক যথার্থই তাঁর ল্যাবরেটারীকে একটী 'নার্শারী' বলে বর্ণনা করেছেন, যেখান থেকে নব্যভারতের যুবা বৈজ্ঞানিক দল বাহির হচ্ছেন।"

নবম অধ্যায়
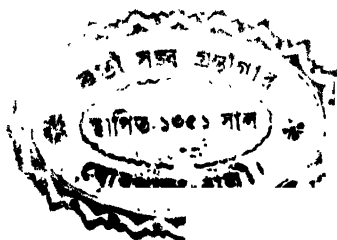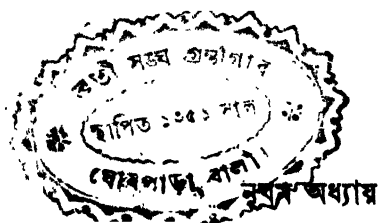
সরকারী কর্ম্মত্যাগ

ডাক্তার রায় যে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। তাঁর গবেষণা, তাঁর আবিষ্কার, তাঁর বিলাতের শ্রেষ্ঠ কাগজে প্রবন্ধমালা—তাঁকে রসায়ন শাস্ত্রে অদ্বিতীয় স্থান দিয়েছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট তাঁর গুণের যোগ্য আদর করলেন না। তিনি সারা জীবন শিক্ষা বিভাগের Provincial (প্রাদেশিক) স্তরেই কাটিয়ে দিলেন, তাঁকে কখনও স্থায়ীভাবে উচ্চ বিভাগে (Imperial Service) উন্নীত করা হয় নি। অনেক সময় তাঁর চেয়ে হীনব্যক্তি উচ্চপদ পেয়েছে, কিন্তু তিনি পান নি।

তবে আশার কথা, গর্ব্বের কথা এই যে দেশ তাঁকে চিনেছে, তাঁর গুণের আদর করতে শিখেছে। তাই তিনি আজ সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান মন্দিরে যোগ দিয়েছেন।

১৯১৪ সালে ডাক্তার রায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করলেন। সেই সময় তাঁর ছাত্রমণ্ডলী

তাঁকে এক অভিনন্দন দেয়। সেই অভিনন্দনে ছাত্রেরা বলেন :—"আপনার নিরাড়ম্বর জীবন আর তার ভারতীয় আদর্শ, আমাদের সেই পুরাতন ভারতীয় যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সব সময়েই আপনি আমাদের পথপ্রদর্শক, নেতা এবং বন্ধু ছিলেন। আপনার মুক্তদ্বার, আপনার সদাপ্রফুল্লতা, আপনার ছাত্রদের প্রতি মুক্তহস্ততা, আপনার নীরব অথচ গভীর স্বদেশ-প্রেমের জন্য মনে হয় আপনি যেন সেই পুরাতন যুগের ঋষি, গুরু—আমাদের জন্য নতুন জন্ম গ্রহণ করেছেন।"

এই অভিনন্দনের উত্তরে ডাক্তার রায় এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন :—"যখন আমার মনে হয় যে বাল্যকালে আমি ৪ বছর হেয়ার স্কুলে পড়েছি—যে স্কুল প্রেসিডেন্সী কলেজের শাখা মাত্র, আবার যখন মনে হয় যে আরও ৪ বছর আমি বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছি—তখনই বেশ বোঝা যায় যে এই কলেজের সঙ্গে আমার সংস্রব ৩৫ বৎসর কাল ব্যাপ্ত হয়েছে। সেই জন্য আমার মনে বড় সাধ যে যেন আমার মৃত্যুর পর আমার একমুঠা চিতাভস্ম এই পবিত্র কলেজের কোনও স্থানে রক্ষিত হয়।"

দশম অধ্যায়
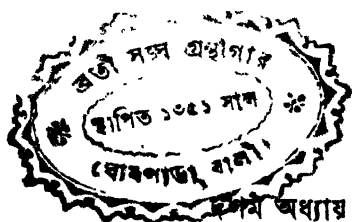
সাহিত্য সাধনা

ডাক্তার রায় আমাদের কাছে রাসায়নিক আর বলে পরিচিত, কিন্তু তাই বলে তিনি বাংলা-ভাষাকে হতশ্রদ্ধা করেন না। তিনি একজন নামজাদা সাহিত্যিক, সাহিত্যের আসরে তিনি সুলেখক বলে পরিচিত। তিনি জানেন যে জাতিকে বড় করে' তুলতে হ'লে, তার মনোরাজ্যে নানা ভাবের নতুন বীজ বপন করতে হলে—আমাদের মাতৃভাষার সাহায্য নিতে হবে। তাই তিনি বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সাধক, তাই তিনি প্রায়ই কলেজে ছেলেদের কাছে বাংলাভাষাতেই বক্তৃতা দেন। সেই জন্য তাঁকে প্রায়ই বলতে শুনেছি ঃ—

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা,
বিনা স্বদেশী ভাষা,
মিটে কি তৃষা ?"

ছেলেবেলা থেকেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলাভাষায় আসক্তি আছে, তিনি বাংলা সাহিত্যের গোঁড়া ভক্ত। বিজ্ঞানের রাজ্যে গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন বলে, তিনি প্রথম

জীবনে বাংলা ভাষায় কোন বই লেখেন নি। যে বইখানি হাতে করে' তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন —সেখানি হচ্ছে—"প্রাণী-বিজ্ঞান।" বিজ্ঞানের দিক থেকে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে মাতৃভাষাকে এখানি তাঁর প্রথম দান। সে-দান মাতৃভাষা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন বল্লে অত্যুক্তি হবে না। এই বই সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ— "ছেলেদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেলে জীব-জন্তু সম্বন্ধে কৌতূহল হতে পারে এই ভেবে একখানা ছোট "প্রাণী-বিজ্ঞান" লিখেছিলাম। কিন্তু বইখানা কয়েক বৎসর পড়ে রইলো, কাটতি হল না। কিছুকাল পরে জানি না কেন, সেখানা টেক্সট্ বুক কমিটীর অনুমোদিত হয়ে গেল। একজন ইন্সপেক্টার পূর্ব্ব বাংলার একটী অঞ্চলের জন্য সেখানা পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট করে দিলে; ব্যস্, এক নিঃশ্বাসে সব বই বিক্রী হয়ে গেল।"

তারপর বোধ হয় বইখানা আর ছাপা হয় নি—সেজন্য বাজারে এখন বইটী পাওয়া যায় না।

তাঁর দ্বিতীয় বই—"বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপ-ব্যবহার" বাংলার শিক্ষিত সমাজে একটা যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল—তা শিক্ষিত মাত্রেই জানেন। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে বাঙালীর প্রতিভা আছে,

মেধা আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে, কিন্তু সেই গুণ কেবল কুপথে চালিত হয়ে নষ্ট হয়েছে, তার প্রকৃত স্ফুরণ হয়নি। সেই জন্য তিনি দৃঢ়ভাবে, নির্ভীকচিত্তে ভ্রান্ত বাঙালী যুবক-দের নতুন পথ দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু দেশে আর একদল লোক ছিল—যারা কতকগুলা অপদার্থ শাস্ত্র দেখিয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতেন। তাদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিভব সম্পত্তি হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্বপুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ।" বঙ্কিমচন্দ্র এই দলের নেতা ছিলেন। তাই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেন—"বঙ্কিম বাবুর একটা লেখা পড়ে আমি এই সন্দর্ভটা লিখি। এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র স্মরণীয় বাঙ্গালীর উল্লেখের সময় রঘুনন্দন, কুল্লুকভট্টের নাম করে বলেছেন—'অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্ন-প্রসবিনী।' এ মত আমি সমর্থন করতে না পেরে, এ মতের বিরুদ্ধে এই বইখানা লিখি। বঙ্কিম-চন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসাবে খুব বড়—আমি স্বীকার করি; তাঁর প্রতিভা যে সেদিকে খুব বিস্তার লাভ করেছিল—মানি। কিন্তু তাঁর ও কথা মানি না—কারণ আমি জানি বাঙালীর বিদ্যা বুদ্ধি ঐ দিকে নিয়োজিত হওয়াতে

আমাদের কতটা জাতীয় অধঃপতন ঘটেছে। সেই জন্য ঐ কথার প্রতিবাদ করে' আমি এ বইখানা লিখি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথার প্রতিবাদ করে' তিনি বলেন :—"এখন বিবেচনার বিষয় এই যে, আজ বর্ত্তমান জগতের ভীষণ জীবন সংঘর্ষের দিনে আপনাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইলে রঘুনন্দন ও কুল্লুকভট্টের টোলে প্রবেশ লাভ করিয়া পুনরায় ন্যায় ও সাংখ্যের গবেষণায় নিযুক্ত হইতে হইবে, কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও প্রতিভার রশ্মি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতে হইবে? আমরা আজ কালবারিধি তীরে দাঁড়াইয়া শুধু কি উত্তাল তরঙ্গমালা গণিয়া হতাশ মনে গৃহে ফিরিব? অথবা নিরাশার তীব্র দংশনের ক্ষোভ মিটাইবার নিমিত্ত ভাবিব, —বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা ও দীক্ষা ভ্রান্তিমূলক, উহা মানবহৃদয়ে জ্বালাময়ী তৃষ্ণা জনন করিয়া সুখ, শান্তি ও আধ্যাত্মিক চিন্তাশীলতার পথ কণ্টক সমাকীর্ণ করে?"

সেই প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হয়ে, বর্ত্তমান জগত থেকে অনেক দূরে ছিলাম বলে আজ আমাদের এত অধঃ-পতন। সেই কথাই তিনি বলেছেন :—"স্বাধীন চিন্তা জাতীয় জীবননদের উৎস। এই উৎস যে দিন হইতে শুকাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে মৌলিকতা

ও অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালী জাতির অধোগতির সূত্রপাত হইয়াছে। আজ সহস্র বৎসর কাল এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত আলস্য এবং অন্ধবিশ্বাসরূপ গভীর কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া জাতীয় জীবনের প্রস্রবণকে রুদ্ধ করিয়াছে।"

ইতিহাস আলোচনা ক'রে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে চিরকাল বাঙালী এমন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল না—বরং তাহাদের একটা গৌরবময় অতীত ছিল। তাই তিনি বলেছেন—"ভারত যে শাস্ত্রবাদগ্রস্ত হইয়া চিরকাল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, এমন নহে। প্রাচীন ভারতে অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি যথেষ্টই বলবতী ছিল এবং স্বাধীন চিন্তার স্রোত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল।"

হিন্দুসমাজ তার মস্তিষ্কের অপব্যবহার তখনই ক'র্‌ল, যখন জগতের উন্নতির ধারার সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ না রেখে, স্বাধীন চিন্তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবলমাত্র কতকগুলি সংস্কার মেনে চলতে লাগ্‌ল। বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর যে নতুন হিন্দুধর্ম্ম দেখা দিল—তাই থেকেই হিন্দুর পতন আরম্ভ হল। কেন না—"বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য কুসংস্কারের এক অতি বৃহৎ অধ্যায়। অনুসন্ধান প্রবৃত্তি এক প্রকার লুপ্তপ্রায় হইল। যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক আভাস জাতীয়

শিক্ষা ও জ্ঞানের সহিত ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, যে কিছু প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদির আলোচনার আভাস সূচিত হইতেছিল, তাহা অত্যল্প কালেই বিনষ্ট হইবার পথে আসিল। এই বিলোপের কারণ শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশ।”

এর ফল যে কি ভীষণ হল, তা ডাক্তার রায় বেশ স্পষ্টভাবে বলেছেন—“হিন্দুর যাহা কিছু তাহাই শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ভিন্ন সকল জাতি ম্লেচ্ছ ও বর্ব্বর, তাহাদের নিকট আমাদের কিছুই শিখিবার নাই, এই প্রকার সংস্কারসকল যে দিন আমাদের জাতীয় চরিত্রে প্রবল অধিকার স্থাপন করিল, সেই দিন হইতে আমাদের উন্নতির মার্গ কণ্টকিত হইল। সেই দিন হইতে হিন্দুজাতি কূপমণ্ডূক হইল, অহঙ্কার ও আত্মাদরে স্ফীত হইয়া জগতের শিক্ষা ও জগতের দীক্ষা তৃণজ্ঞান করিয়া অলক্ষিতভাবে অবনতির গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইল।”

যখন সে পুরাতন যুগ চলে গেল, যখন তার স্থানে নতুনের আবির্ভাব হল তখন “বাঙালীর এক সুযোগ আসিয়া উপস্থিত” হল। কিন্তু বাঙালী সে সুযোগকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে নি—তার মস্তিষ্কের অপব্যবহারের দরুণ সে সুযোগও হেলায় হারিয়েছিল।

সেই কথা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন—"এই সময়ে বাঙালী কেরাণীর সৃষ্টি ইংরাজ বণিক প্রজাপতির কৃপায় আরম্ভ হইল। ইংরাজ বণিক বাঙালীর সহায়তা ভিন্ন ব্যবসায় চালাইতে পারিতেন না; ক্রয় বিক্রয় আদান প্রদান প্রথমতঃ প্রায় সমস্তই বাঙালী কেরাণীর হাত দিয়াই হইত। অনেক নিরক্ষর হৌসের মুৎসুদ্দিরা এই সুযোগে ক্রোড়পতি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অশিক্ষিতের হাতে বিপুল ঐশ্বর্য্যের আগমনে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতে লাগিল। ইন্দ্রিয়ের প্রবল প্ররোচনায় ও স্বাচ্ছন্দ্যের বাতাসে বিলাসিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—কর্ম্মক্ষম হইয়াও বাঙালী স্বাধীন ব্যবসার দ্বারা স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে গুজরাট, রাজপুতানা (বিকানীর) ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সমস্ত ব্যবসা দখল করিতে লাগিলেন, আর বাঙালী ধ্রুবতারার ন্যায় কেরাণীগিরি লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন।"

এই রকমে বাঙালী কেরাণীগিরিতে তার প্রতিভার, তার মস্তিষ্কের অপব্যবহার করেছে বলে—আজ এক বিরাট অন্নসমস্যা বাঙালীর সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে।

যখন এই বইখানা প্রথম বেরুল, তখন গোঁড়া

হিন্দুসমাজ তাঁর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তিনি সাহসের সঙ্গে হিন্দুর কুসংস্কারগুলি শিক্ষিতদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই অনেকে তাঁর ওপর খড়্গহস্ত হয়েছিলেন, অনেক সংবাদপত্রে তাঁর নামে নিন্দা বেরিয়েছিল। তবু তিনি সেই নিন্দাবাদে কাতর হন নি, কারণ দেশের ও সমাজের মঙ্গলের জন্যই তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংলার প্রতিভা আছে, মেধা আছে—তার অপব্যবহার না হয়ে যদি ঠিক দিকে নিয়োজিত হয় তবে বাঙালী বাংলার মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।

"অন্নসমস্যা"

তাঁর সব বাংলা বইগুলির মধ্যে "অন্নসমস্যা"কে শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে পারি। আজ বাংলার জাতীয় জীবনে এমন এক অবস্থা এসেছে যখন বাঙালী এই সনাতন সমস্যার মীমাংসা না করে অন্য কাজে অগ্রসর হতে পারে না। তাই আজ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে সমস্যা আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন, তার মীমাংসা আমাদের করতে হবে।

অন্নসমস্যার প্রথম অংশ—ডাক্তার রায় হাওড়া প্রদর্শনীতে সভাপতিরূপে বক্তৃতা দেন। অপর অংশগুলি এলবার্ট ইনষ্টিটিউটের অধিবেশনে ধারাবাহিক ভাবে

ছাত্রমহলের কাছে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সভায় স্যর আশুতোষ চৌধুরী সভাপতি ছিলেন। এই সব অংশগুলি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

আমাদের দেশে শত শত ছেলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ নিয়ে প্রতি বছর বেরিয়ে আস্‌ছে—তারা কি করে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন করবে? এই সমস্যা আজ আমাদের সামনে ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে হাজির হয়েছে। এই শিক্ষার কথা তিনি বলেছেন—"আপনারা সকলেই জানেন সেই পুরাতন হিন্দু কলেজের কথা—যেখানে বাঙালীর ছেলে সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী চর্চ্চা আরম্ভ করে। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি থেকে বরাবর আজ পর্য্যন্ত আমরা চলেছি—একভাবে একই বাঁধাপথে। এই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলবার কালে এখন একবার উচ্চ স্বরে বলে উঠতে হবে—'থামো, থামো'।

এখন শুধু চাকরীর দিকে আমাদের ছুটলে চলবে না। "চাকরীর বাজার আগে ভাল ছিল বটে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ থেকে ইংরাজী শিখে বাঙালী চাকরীই করছে। শিক্ষিত যুবক আগে মুন্সেফ ডেপুটী হতে পারতেন—গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী অফিসে নানারকম কাজকর্ম্ম জুটত। ইংরেজ যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বর্ম্মায় রাজ্য

বিস্তার করলেন—তখন বাঙালী সেখানেও গেল চাকরী করতে, আর মাড়োয়ারী, বোম্বেওয়ালা প্রভৃতি গেলেন ব্যবসা করতে। ডিগ্রী থাকলে চাকরীর বড় সুবিধা হত, তাই তখন ডিগ্রীর একটা অকৃত্রিম মূল্য হয়েছিল। আর সেই কারণেই শিক্ষিত বাঙালীর চাকরীই একধ্যান একজ্ঞান হয়ে উঠল। কিন্তু এখন শিক্ষিতের সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে। এত চাকরী জুটবে কোথা থেকে? অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ব্যবহারের সামঞ্জস্য করতে না পারলে ঘটনাচক্রের পেষণে মরতে হবে আমাদেরই। সুতরাং চাকরীর পথ ছেড়ে অন্যপথ ধরতে হবে।"

তাই যারা আইন পড়তে চায়, তাদের তিনি উৎসাহ দেন না। তাঁর পরিচিত ছাত্রের মধ্যে কেউ আইন পড়ছে শুনলে, তিনি ভারি রাগ করেন। তিনি বলেছেন—"আবার যিনি গ্রাজুয়েট হয়েছেন, তিনি ভাবেন আইন পড়তে না গেলে মহা অপরাধ হবে, আর জিজ্ঞাসা করলে বলেন—'পাশটা করে রাখি।' আজকাল জেলার সদরে বা মহকুমায় উকীলরা কি রোজগার করেন, তাঁদের কয়জন অন্ন পান এবং কয়জন গাছতলায় কেরাসিনের বাক্সের উপর বসে দিন কাটান—এরূপ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বিজ্ঞ ব্যক্তি উত্তরটা কানে কানে দেবেন—কারণ সেটা

সাধারণের বড় প্রীতিকর হবে না। স্যর আশুতোষ প্রতিভাশালী পণ্ডিত, শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক করেছেন এ সবই স্বীকার করি। কিন্তু আইন কলেজ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার বন্‌ল না। আমায় যদি কেউ একদিনের জন্যও কল্‌কাতার সর্ব্বময় কর্ত্তা (Dictator) করে তবে ল-কলেজটীকে আমি আগে ভূমিসাৎ করি; অন্ততঃ দশবছরের জন্য আইন পড়া উঠিয়ে দিই। কারণ তা হ'লে উপোসী উকীলদের অন্ন হতে পারে। আর ব্যাধির শেষ কি এইখানে ? এদেশের ছাত্র বি-এল পাশ করে ভাবেন এম-এল হবেন। যেন বিধাতা তাঁদের সৃষ্টি করেছেন শরীর ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে পরীক্ষা পাশ করতে এবং যমসদনে যেতে।"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ল-কলেজ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন—তা নিয়ে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। সকলেই জানেন যে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই ল-কলেজ স্থাপন করেছেন বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। তাই যখন ডাক্তার রায় সাধারণের সামনে বল্লেন যে আইন কলেজের আর দরকার নেই, সেটীকে ভূমিসাৎ করে ফেলা উচিত, তখন স্যর আশুতোষ বিশেষ সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। এর উত্তরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায়

বলেছিলেন যে, যদি উকীলদের এমন ভাবে গালি (villify) দেওয়া হয়, তবে তাঁরা শিক্ষার জন্য টাকা দেবেন কেন? কিন্তু বাস্তবিক ডাক্তার রায় উকীল সমাজকে গালি দেন নি। তিনি বরং প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় আমার বক্তব্যের উল্টা মানেই অনেকেই করেছেন। আইনজ্ঞেরা আমার শত্রু, এমন উৎকট অদ্ভুত কথা আমি বলিনি। বাংলার ব্যবহারজীবীদের নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, ডবলিউ, সি, ব্যানার্জী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি রাজনৈতিক নেতৃগণ, কলিকাতা সায়ান্স কলেজের প্রাণস্বরূপ স্যর তারকনাথ ও স্যর রাসবিহারী এবং মনস্বী জষ্টিস্ চৌধুরী, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও সি, আর, দাশ প্রভৃতি ব্যবহারজীবিগণ বাংলার সকল শুভকার্য্যে অগ্রণীস্বরূপ। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিজ্ঞ ব্যবহারজীবীর স্থান কোথায় মহামতি বার্ক তা অতি সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করে গেছেন। কিন্তু ছোট বড় সকল প্রকার আদালতের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েও যাঁরা উপোস করে থাকতে বাধ্য হন, বার লাইব্রেরীর চাঁদার পয়সাটা যাঁরা দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না এবং স্থল বিশেষে এক ছিলিম তামাক পেলে যাঁরা কয়েক পাতা নকল

করে দিতে পারেন, এমন উকীলরা কি ওকালতি ব্যাপারটার মর্য্যাদা হানি করছেন না ? তাই বল্‌ছিলাম—উকীল তৈরী করবার কলটা যদি বেশ কয়েক বৎসর বন্ধ থাকে, তবে গোবেচারী উপোসকারীর দল বেঁচে যেতে পারে। প্রয়োজন ও আয়োজনের মধ্যে অসামঞ্জস্য কত বেশী হয়ে পড়েছে বিবেচনা করে দেখা উচিত। তা হ'লে দফে দফে উকীল তৈরী ক'রে তাদের দফা রফা করবার প্রবৃত্তি হবে না।"

তাই তিনি বাংলার ছেলেদের ডেকে বলছেন যে গতানুগতিক ভাবে সেই এক মামুলী রাস্তায় না ছুটে—একটা নতুন পথ বার করতে। সেই পথ—ব্যবসার ও বাণিজ্যের পথ। ব্যবসায়ে কি কি দরকার তাও তিনি বলেছেন। প্রথম দরকার হচ্ছে শিক্ষার। তাই তিনি বলেন—"ব্যবসায় আরম্ভ করেই কিছু সফল হওয়া যায় না। চেষ্টা চাই, ধৈর্য্য চাই। কেমিষ্ট্রী বা রসায়ন শিখতে হলে যেমন পরীক্ষাগার (Laboratory) চাই, ব্যবসা শিখতে হলেও পরীক্ষাগারের তেমনি দরকার। ক্লাইব ষ্ট্রীট, ক্যানিং ষ্ট্রীট, বড়বাজার, এজরা ষ্ট্রীট—এইসব স্থান হচ্ছে ব্যবসা শিক্ষার পরীক্ষাগার। এই সব রাস্তায় চোখ চেয়ে ঘুরে ফিরে বাজারের হালচাল বুঝতে হবে। কোন মাড়োয়ারী বা

য়ুরোপীয়ানের দোকানে শিক্ষানবিশীর বড় প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে ভুঁইফোঁড়ের স্থান নেই,—হাতে কলমে কাজ শিখতে হবে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিছি।”

বর্ত্তমানেও তু’একজন বাঙালী ব্যবসাক্ষেত্রে নাম করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন,—“স্যর রাজেন্দ্রনাথ, জে, সি, ব্যানার্জ্জী, কয়লাখনির স্বত্বাধিকারী, এন, সি, সরকার, রেলওয়ে ট্রাফিকের এস, সি, ঘোষ এঁরা উপাধির ধার ধারেন না। জে, সি, ব্যানার্জীর কৃতিত্ব বাংলা দেশ ছাড়িয়ে বোম্বাই পুণা প্রভৃতি স্থানে পৌঁছেচে। সেখানে এখন একোটী টাকার কণ্ট্রাক্ট তাঁর হাতে। বাঙালীর বোম্বাই প্রদেশে এই প্রথম প্রতিষ্ঠা; আমাদের পক্ষে এ বড় গৌরবের কথা!”

যখন আমাদের সামনেই এই সব জ্বলন্ত আদর্শ খাড়া রয়েছে, তখন আমাদের সকলেরই উচিত এই নূতন পথে ধাবিত হওয়া। তাই তিনি বলেছেন,—“কঠিন সমস্যা-সকলের মীমাংসা করবার ভার আমাদের হাতে—আমাদের কি তুর্ব্বলচিত্ত, চাকরীপ্রিয়, বিলাসী বাবু হওয়া সাজে? শক্ত হতে হবে, দৃঢ়ব্রত হতে হবে, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট মানুষ হতে হবে। অন্নসমস্যার মীমাংসা করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে। তাই ব্যবসা

বাণিজ্য ছাড়া আজ আমার অন্য কিছু বলবার নেই। এসব কাজে আমাদের স্পৃহা নেই—প্রবৃত্তি নেই। এই প্রবৃত্তি আগে জাগিয়ে তুলতে হবে, এই স্পৃহা মনে তীব্র হলে নতুন পথে চলবার সাহস হবে। তাই এত কথা বলছি।"

"জাতিভেদ সমস্যা"

ডাক্তার রায় কেবল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নন, তাঁর সমাজ সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে যে দূরদৃষ্টি আছে তা তাঁর "জাতিভেদ সমস্যা" বা "পাতিত্য সমস্যা" পড়লেই বেশ বোঝা যায়। এই বইগুলিতে তিনি হিন্দুর জাতি-ভেদের দোষ দেখিয়েছেন—সেই জন্য গোঁড়া হিন্দুরা তাঁর মতে নাসিকা সঙ্কুচিত করতে পারেন। কিন্তু সে দোষগুলি যে এই বিংশ শতাব্দীর উন্নতির যুগে কোন সজীব সমাজের থাকা উচিত নয়—তা বোধ হয় কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিই অস্বীকার করবেন না।

"জাতিভেদ সমস্যা"তে সেই দোষগুলির উল্লেখ ক'রে বলেছেন,—"স্বীকার করতেই হবে যে জাতিভেদ প্রথার ভীষণ বন্ধনে আমরা আড়ষ্ট হয়ে আছি, অধঃপাতে গেছি; এতই অধঃপাতে গেছি যে আবার ধর্ম্মের অজুহাতে, আধ্যা-ত্মিকতার দোহাই দিয়ে আমরা এই প্রথাকে—বিশেষতঃ

এই ছোঁয়াছুয়ি ব্যাপারটীকে—বিধিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রমাণ না করে ছাড়ছি না।”

তাই তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে বলছেন—“এখন আমরা সভ্যজগতে সকল জাতির সঙ্গে এক আসরে বসতে চাই ; পৃথিবীর জাতিসঙ্ঘে (League of Nations) স্থান পেতে চাই। কিন্তু অন্যে আমাদের কি চক্ষে দেখে আজ তা তোমাদের ভেবে দেখতে হবে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে ভারতবর্ষের যোগ্য প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে আরম্ভ মাত্র—কোকিলের প্রথম গান বসন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে মাত্র। দারিদ্র্য ও সামাজিক অত্যাচার প্রভৃতি নানা দোষের জন্য আজও আমরা অন্য জাতির অশ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছি। আমাদের অন্তর সমৃদ্ধ হয়ে অদূর ভবিষ্যতে নানা-কর্ম্মে বৈচিত্র্যে বিকাশলাভ করবে না কি? আমরা বিলাতী বিস্কুট খাবো, বরফ দিয়ে সোডা লেমনেড খাবো, কিন্তু জাতিবিশেষের কেউ যদি হাতে করে এক গ্লাস জল দেয় অথবা আমাদের চৌকাঠ মাড়ায় তাহলে অমনি চীৎকার—“জাত গেল, হাঁড়ি ফেল, স্নান কর।” অদ্ভুত ব্যাপার! তারই ফলে আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র মিলে সকল জাতিটাই বিদেশের অগ্রসর জাতিদের কাছে হেয় অস্পৃশ্য

অপাংক্তেয় হয়ে আছি। যতকাল নিজেদের স্বভাব শোধন না করব, ততকাল এমনি থাকতে হবে। সুতরাং সাধু সাবধান।”

“পাতিত্য সমস্যা”

ডাক্তার রায় চান না যে কেবল উচ্চজাতির ২।১০ জন বড় হয়, তিনি চান যে দেশের সব লোকই উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। তিনি চান যে যাদের আমরা রোজ ঘৃণার চক্ষে দেখি, তাদের যেন আমরা ভাই বলে কোলে টেনে নিতে পারি।

একথা কেবল তিনি মুখে ও কাগজে প্রচার করেন না, সব সময়ে কাজে দেখাতে চান। যখন প্রতিবৎসর তিনি গ্রীষ্মকালে ‘দেশে’ যান, তখন তাঁর বেশীর ভাগ সময়টা কাটে—মাহিষ্য, পোদ, কৈবর্ত্তদের সঙ্গে। তাঁর ভাই এত বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না, তাই সময়ে সময়ে বলেন—“ফুলু, তুই চাষাদের এত আস্কারা দিস্ না, এত আদর ওদের দিলে, শেষে খাজনা আদায় করা দায় হবে।”

এ কথা কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি ছোট বড় সকল জাতির মধ্যেই মহত্ত্ব দেখতে পান। তাই তিনি বলেন,—“আমি কোন সমাজভুক্ত নই। আমি হিন্দুর

হিন্দুত্ব, মুসলমানের মুসলমানত্ব, ব্রাত্যক্ষত্রিয়ের ব্রাত্যক্ষত্রিয়ত্ব গ্রহণ করি। আমি রাসায়নিক। আমি নিক্তির ওজন করে সকলের ভালমন্দ ওজন করে বিচার করতে চাই।"

১৯২০ সালে ২১শে মার্চ্চ খুলনাতে পৌণ্ড্রকক্ষত্রিয় সামাজিক সভার অধিবেশন হয়। সভার পক্ষ থেকে যখন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে নিমন্ত্রণ এল, তখন তিনি সানন্দেই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের উন্নতির জন্য সব রকমে সাহায্য করতে তিনি রাজী ছিলেন। সেই সভার সভাপতিরূপে তিনি বলেছিলেন—"আমরা দেশকে মা বলি। যাঁরা লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেন আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি তাঁরা যদি বাংলাকে মা বলেন তবে কি সকলকে ভাই বলে আলিঙ্গন করবেন না—মায়ের সন্তানকে পদাঘাত করে দূরে ঠেলে কি তাঁরা অগ্রসর হবেন?—তবে তাঁদের কিসের মা বলা?"

সেই জন্য তিনি বলেন—"সবাই মায়ের সন্তান—সকলকে কোলে টেনে নিতে হবে। যে পেছনে আছে তাকে তুলতে হবে। যিনি শিক্ষিত তিনি অশিক্ষিতকে টেনে নেবেন।"

পৌণ্ড্রকদের উদ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন—"চাই শিক্ষা। উন্নতির জন্য কি দরকার? আমি বলব—

১ম—শিক্ষা, ২য়—শিক্ষা, ৩য়—শিক্ষা। শিক্ষা ভিন্ন পশুত্বে ও মনুষ্যত্বে কোন প্রভেদ নেই। আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি আপনারা প্রতিজ্ঞা করুন—শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ করবেন। আপনাদের আয়ের অন্ততঃ একদশমাংশ স্বজাতির শিক্ষার জন্য ব্যয় করুন। যেমন কালীপূজার বারোয়ারীর জন্য এক পয়সা করে রাখা হয়, তেমনি ক'রে আপনারা যে ধান পান তার যদি দশমাংশ এমন কি শতাংশও আপনাদের উন্নতির জন্য রেখে দেন, আপনাদের উন্নতি আটকে রাখে কে? আপনারা নিজেরাই নিজেদের উন্নতি আটকে রেখেছেন। শিক্ষার বিস্তার করুন। উন্নতি ধ্রুব নিশ্চয়।"

সমাজ সংস্কার

গত ১৯১৭ অব্দে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভারতীয় সামাজিক সম্মিলনের সভাপতিরূপে বৃত হন। তাঁর অভিভাষণে তিনি হিন্দু সমাজের যে সব সামাজিক ব্যাধি আছে, তার উল্লেখ করেন ও হিন্দুসমাজের নেতাদের সেই সব ব্যাধি দূর করবার জন্য আহ্বান করেন। যাতে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় ও অস্পৃশ্যতা দূর হয় সেই জন্য তিনি খুব চেষ্টা করেন। পণ-প্রথার বিরুদ্ধে তিনি বলেন—

"এই যে যুবকবৃন্দকে সামনে দেখ্‌ছি, এদের অনেকে এম-এ, বি-এ পড়্‌ছে। বিবাহের বাজারে কারো ৫।৭ হাজারের কম পোষাবে না। কত গরীব মেয়ের বাপ এতে সর্ব্বস্বান্ত হয়, কত ঘরে বিষাদের ছায়া পড়ে! যদি বলা যায়, ধিক তোমাদের লেখাপড়ায়, আবার দেশ উদ্ধার করতে এসেছ—অমনি নাকি স্বুরে বল্‌বে, কি কর্‌ব—বাপ-মার কথা অমান্য করি কিরূপে, তাঁরা আমার জন্য এত করছেন, ইত্যাদি। আমি তো বলে থাকি "Every unmarried young man of Bengal is a prospective assassinator of a Snehalata." অশ্বিনীবাবু বল্‌তেন—"এখনকার ছেলেরা কেবল বিবাহের বাজারে স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পিতৃ-মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। অনেক বাপ-মাও ছেলের বিবাহ দিয়ে, তার জন্য যা খরচ হয়েছে তা স্বুদে আসলে আদায় করবার জন্য ফাঁদ পেতে বসে থাকেন।"

কত যে অন্ধ কুসংস্কার আমাদের উন্নতির অন্তরায় হয়ে রয়েছে, তাও তিনি দেখান। তিনি বলেন—বাঙালী ছেলেদের জীবন ঘরে এক প্রকার, বাহিরে আর এক প্রকার। এই দ্বিধাবিভক্ত জীবন বহন করে ব্যক্তিত্বটুকু পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেয়। মা বলেছেন, আজ গ্রহণ পূর্ণগ্রাস,

অসুর এসে দেবতাকে গ্রাস করবে, অতএব—যাত্রা নাস্তি, হাঁড়ি ফেল্‌তে হবে, স্নান করে শুদ্ধ হতে হবে; তাই মেনে নিলাম—অথচ ক্লাশে পড়েছি—"Shadow of the earth creeps over the moon." etc. একটু সাহস বাঁধ, ভাবতে শিখ, তবে ত দেশ জাগবে।"

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তিনি বলেন :—"এ ভণ্ডামি আর চল্‌বে না। বরফ খাব, সোডা খাব, ষ্টীমারে বাবুর্চির রান্না খাব, সাহেবের হোটেলে খাব, আবার নামাবলীও ঠিক রাখব, তা হয় না।...এই ছুঁৎমার্গের হাত এড়াতে না পারলে হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবী হতে লোপ পাবে। এসব ছাই-পাঁশ দূরে ফেলে দিয়ে, হিন্দুজাতিকে বক্ষ বিস্তার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে; নোংরা দেশাচার পাপাচার আকঁড়ে থাক্‌লে চল্‌বে না।"

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা

রাসায়নিক হলেও, বাংলাসাহিত্য প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা থেকে বঞ্চিত নয়। যখন রাজসাহীতে দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হয়, তখন বাংলার সাহিত্যিকগণ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকেই সভাপতির আসনে বরণ করেন। সেই অভিভাষণে তিনি বাংলাসাহিত্যে বৈজ্ঞানিক রচনার অভাব কতটা তা দেখান ও বৈজ্ঞানিক-

দের অনুরোধ করেন যে তাঁরা যেন নিজেদের রচনা বাংলা-ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

বাংলার নানা মাসিকপত্রে আচার্য্যের রচনা দেখা যায়। অনেক বৎসর পূর্ব্বে তিনি "মানসী"তে বাঙালীর দৈহিক অবনতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যখন তিনি আসাম ছাত্রসম্মেলনের সভাপতির কাজ শেষ করে ফেরেন, তখন তিনি "প্রবাসী"তে 'আসমিয়া সাহিত্য' সম্বন্ধে একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'অন্নসমস্যা' প্রথমে "প্রবাসী"তেই প্রকাশ হয়। এ ছাড়া "প্রবাসী"তে তাঁর আরও অনেক রচনা প্রকাশ হইয়াছে। 'মাসিক বসুমতী'-তেও তাঁর অনেক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ধারা' উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিকের মত বাংলা গদ্যসাহিত্যের সব ধারাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখান। এতে দেখা যায় যে আচার্য্য রায় কেবল বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন না, সাহিত্যের সব ধারা ও আন্দোলনেরও খবর রাখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন :—

"কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ ইংরাজ মিশনারীদিগের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় দত্তের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য-গঠন-কার্য্য ও পরিপাট্য সাধন চলিতে-

ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাহাতে প্রাণ-সঞ্চার করিলেন। এইখানেই বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ব—বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব—বিদ্যাসাগরের অমরত্ব।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' সম্বন্ধে তিনি বলেন—"এই একখানি গ্রন্থেই তাঁহার নাম বঙ্গবাসীর চিরস্মরণীয় রহিবে। রাশিরাশি বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া যে জ্ঞানলাভ না হয়, একমাত্র সিংহ মহাশয়ের 'মহাভারত' পাঠ করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করা যায়, ইহা আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।"

বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি বলেন :—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের নবযুগের সর্ব্বপ্রধান প্রতিভাশালী সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মাইকেল মধুসূদন যেমন কাব্যসাহিত্যের চিরন্তন নিয়মভঙ্গ করিয়া এক অভিনব ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া নবভাবের অবতারণা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও সেইরূপ প্রচলিত গদ্য-সাহিত্যকে এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়িলেন।...বঙ্কিমের প্রতিভা যেন স্পর্শমণি; যাহা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাই সুবর্ণে পরিণত করিয়াছে।"

নাট্যসাহিত্য আলোচনায় তিনি বলেন :—

"আমাদের জাতীয় গৌরব বিনষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে

জাতীয় নাট্যশালাও অন্তর্হিত হইয়াছে। সাত শত বর্ষের পরাধীনতায় আমাদের অন্তর্নিহিত আনন্দধারা বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। নাট্যশালা জাতীয় আনন্দ ও সজীবতার নিদর্শন। ইংরাজরা এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিবার পর হইতে তাঁহাদের আদর্শে পুনরায় এদেশে নাট্যশালা স্থাপিত ও নাটক-রচনার সূত্রপাত হইয়াছে।”*
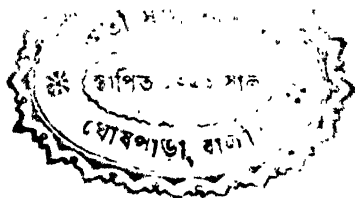
* মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৩১, পৃঃ ৮১৪।
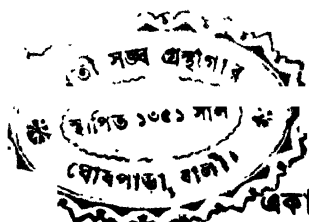
একাদশ অধ্যায়

নাইট উপাধি লাভ

যখন জগৎময় জার্ম্মণ-যুদ্ধ চলছিল, তখন যুদ্ধ চালাবার জন্যে অনেক গোলাগুলি বারুদের দরকার হয়েছিল। সে-সব জিনিষ বেঙ্গল কেমিক্যাল অনেক পরিমাণে ভারত সরকারকে দিয়েছিল। সেই যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বেঙ্গল কেমিক্যালের নেতা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে সম্রাট "স্যর" উপাধি দেন। যখন তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হ'ল, তখন বিলাতের কেমিক্যাল সোসাইটী তাঁকে অভিনন্দন করে এই চিঠি লেখেন :—

Chemical Society
Burlington House
London, W. I.
11 February, 1919.

Dear Sir Profulla Ray,

The Council of the Chemical Society has noted with much pleasure that His Majesty

has been pleased to confer the honour of knighthood on you and has requested me to offer you its hearty congratulations on this well-merited mark of distinction.

It is the sincere hope of the members of the Council that you may long be spared to continue your unique work in connexion with the development of chemical research in India.

Believe me,
(Sd.) W. J. Pope
President.

পুনরায় বিলাত যাত্রা

১৯২১ সালে আগষ্ট মাসে ডাক্তার রায় পুনরায় বিলাত যান। এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বিলাতে পাঠান—উচ্চাঙ্গের রসায়ন-চর্চ্চা করবার জন্য। তাঁর সঙ্গে ৪০।৫০ জন বাঙালী ছাত্রও বিলাতে পড়তে যান। তাঁরা সকলে দেশী কোম্পানী Scindia Navigation Coy.র

জাহাজ Loyaltyতে চড়ে বিলাতে যান। রাস্তায় কোনই কষ্ট হয় নি, কারণ সহযাত্রী প্রায় সবই ভারতীয় ছিলেন।

বিলাতে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে, গবেষণা করে তিনি ফিরে আসেন। তখন ভারতে অসহযোগ আন্দোলন খুব জোর চলছিল। তিনি বিলাত থেকে ফিরে তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনও বন্ধুকে বলেছিলেন—

"আমি যে যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি হাজার হাজার ছাত্র বিজ্ঞান, বিশেষতঃ উচ্চাঙ্গের রসায়ন শাস্ত্র চর্চ্চা করিতে ব্রতী আছে। ইংরেজ জাতি বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে উচ্চাঙ্গের রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চা ভিন্ন উন্নতির আর উপায় নাই।"—সেই জন্য বিলাত থেকে এসে, আচার্য্য রায় এদেশে রসায়নশাস্ত্রের উন্নতির দিকে মন দিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

দেশ-সেবা

এতদ্দিন (১৯২২ পর্য্যন্ত) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপক-রূপেই জনসমাজে অধিক পরিচিত ছিলেন। রসায়নশাস্ত্র চর্চ্চার অধ্যাপনে ও বেঙ্গল কেমিক্যাল পরিদর্শনে তাঁর সময় অতিবাহিত হত। সামাজিক সমস্যা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও, রাজনীতি তাঁর প্রিয় ছিল না। তিনি রাজনীতির কোলাহল থেকে তাঁর বিজ্ঞান-মন্দিরের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে বেশী ভালবাসতেন। কিন্তু খুলনার দুর্ভিক্ষের পর থেকেই তিনি রসায়নশাস্ত্রের সঙ্গে রাজনীতিকে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এখন থেকে তাঁর জীবনে এক নতুন ধারা আরম্ভ হল।

খুলনা দুর্ভিক্ষ

যখন খুলনা জেলাময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, সরকারের তরফ থেকে বর্দ্ধমানের মহারাজ বল্লেন যে তিনি নিজে খুলনা পরিদর্শন করে এসেছেন, সেখানে দুর্ভিক্ষ হয়নি। কিন্তু যারা প্রত্যক্ষদর্শী তারা জানতে পারল যে খুলনায়

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কি ভীষণ। সেখানে শত শত নরনারী অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এই শোচনীয় সংবাদ শুনে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের করুণ হৃদয় বিচলিত হল। আগেই বলা হয়েছে যে খুলনা জেলায় তাঁর জন্মস্থান। যখন প্রতিদিনই আচার্য্য খবর পেতে লাগলেন যে অনেক শিশু, অনেক নরনারী খাদ্যের অভাবে কালগ্রাসে পতিত হচ্ছে, তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। খুলনা জেলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের সাহায্য করবার জন্যে আচার্য্য রায় অগ্রসর হলেন। তিনি সারা বাংলা, তথা সারা ভারতকে আহ্বান করলেন এই দুর্ভিক্ষে সাহায্য করবার জন্য। এ কাজে তাঁর প্রিয় ছাত্রসামাজ অগ্রসর হয়ে এল, তিনি ও বাংলার ছাত্রসমাজ দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন দুর্ভিক্ষ দূর করবার জন্য। যখন সরকার দুর্ভিক্ষের সময় নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন, কোন ভাবেই সাহায্য করলেন না, তখনই আচর্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দেশের লোকের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা সংগ্রহ করলেন লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। আচার্য্য রায়ের দানশীলতার কথা বাংলা দেশের সবাই জানে, তাই দেশবাসী বিশ্বাস করে তাঁর হাতে তিন লক্ষ টাকা তুলে দিতে পেরেছিল।

এই রকমে আচার্য্য রায় তাঁর ক্ষুদ্র কলেজের গণ্ডীর

বাইরে, তার প্রিয় ছাত্রসমাজের গণ্ডীর বাইরে জন-সাধারণের নিকট পরিচিত হলেন। এতদিন তিনি শুধু ছাত্রসমাজের কাছে পরিচিত ছিলেন তাঁর নানা কাজের জন্য, এখন সারা দেশবাসী তাঁর কাজের কথা, দানশীলতার কথা জানল। জনসাধারণ এখন পি, সি, রায়কে দেখবার জন্য ব্যস্ত হল।

এই সময় অসহযোগ-আন্দোলন প্রবল বেগে চলছিল। মহাত্মা গান্ধী তখন চরকা-মন্ত্র প্রচার করছিলেন। আচার্য্য রায় প্রথমে চরকা ও খদ্দরের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথমে তিনি চরকার বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করেন। কিন্তু এই খুলনা দুর্ভিক্ষ তাঁর মতের পরিবর্ত্তন ঘটায়। যখন খুলনা দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কমে এল, তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের কি কাজ দেওয়া যেতে পারে, যাতে তারা সমস্ত দিন ব্যাপৃত থাকতে পারে ও তাদের জীবিকারও সংস্থান হতে পারে। তিনি যখন দেখলেন যে, যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীরা অবসর সময়ে চরকা কাটে, তবে তাতে তাদের অনেক সাহায্য হবে, তখন তিনি নিজে চরকা মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। তাঁর উৎসাহে ও চেষ্টায় খুলনার ঘরে ঘরে চরকা চলতে লাগ্‌ল।

উত্তর বঙ্গে বন্যা

আচার্য্য রায়ের দেশসেবা এখানেই শেষ হল না। শীঘ্রই দেশসেবার জন্য তিনি আরও সুযোগ পেলেন। ১৯২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পূজার সময় উত্তর বঙ্গ ভীষণ বন্যায় প্লাবিত হয়। সারা রাজসাহী জেলা, পাবনা ও বগুড়া জেলার কিয়দংশ বন্যায় একেবারে ভেসে যায়। বন্যার জলে লোকের ঘর-বাড়ী ভেসে যায়, গরু-বাছুর নষ্ট হয়ে যায়, শস্য একেবারে খারাপ হয়ে যায়। জল কোথাও কোথাও সাত আট হাত উঠেছিল। রেল লাইন ভেঙ্গে গিয়ে লোকের ভয়ানক অসুবিধা হয়েছিল। এই বন্যায় উত্তর বঙ্গের যথেষ্ট ক্ষতি করে। সরকারী মতে প্রায় ১৮০০ বর্গ মাইল বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। এতখানি জায়গার সব বাড়ীঘর ভেসে যায়, ৪০।৫০ জন লোক মারা যায়, ১২ হাজার গরুবাছুরের কোন খবর পাওয়া যায় না। আর শস্যও সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যখন কলিকাতায় এই নিদারুণ সংবাদ পৌঁছল, তখন সরকার নিশ্চেষ্ট হয়ে রয়েছেন, জনসাধারণও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে রয়েছে। নেতারা স্থির করতে পারছিলেন না যে এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য। এমন অবস্থায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকতে না পেরে, কলিকাতাবাসীদের

এক সভায় আহ্বান করলেন। সেই সভায় এক কমিটী গঠিত হল, যার হাতে বন্যায় সাহায্য করবার ভার দেওয়া হল। এই কমিটী—যা বেঙ্গল রিলিফ কমিটী নামে পরিচিত—তৎক্ষণাৎ কাজে অগ্রসর হলেন। আচার্য্যকে কাজে নামতে দেখে তাঁর প্রিয় ছাত্রসমাজও তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করতে এল, আর জনসাধারণও তাঁর কাজে সহানুভূতি দেখাতে লাগ্‌ল। সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ যুবকদল এই কাজে আত্মসমর্পণ করলেন। যুবকগণ পথে পথে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা ভিক্ষায় বাহির হলেন। কলিকাতায় ও মফঃস্বলের বড় বড় সহরে যুবকেরা চাঁদা সংগ্রহে ব্যস্ত হলেন। বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা তাদের সাধ্যানুসারে চাঁদা দিতে লাগলেন, এমন কি পথের কুলি মজুরও নিজেদের রোজ পাওনা থেকে সাহায্য করতে লাগ্‌ল। টাকা ছাড়া বন্যাপীড়িত লোকদের জন্য জামা-কাপড়ের দরকার। তাই গাড়ী গাড়ী জামা-কাপড় বোঝাই হয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞান-মন্দিরে উপস্থিত হতে লাগ্‌ল। সেখানে আচার্য্য স্বয়ং তাঁর প্রিয় শিষ্যদের নিয়ে সব কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। একদল যুবক কেবল টাকা পয়সার হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, টাকা ও পয়সা গুণতেই তাঁদের সময় থাকত না, অন্যদল জামা-

কাপড়ের হিসাব করতেন। সমস্ত বিজ্ঞান-মন্দির (Science College) বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর কর্ম্মকেন্দ্র হয়ে উঠ্ল। সেখান থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা গাড়ী করে জামা-কাপড় ও চাল-ডাল নিয়ে বন্যাস্থলে যাত্রা করলেন। সুভাষ বসু ও অপরাপর যুবকরা বন্যাস্থলে কাজ করতে অগ্রসর হলেন। এই ভাবে আচার্য্য রায় বন্যা-পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করলেন।

আচার্য্য রায় এ-কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন বলে, এত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ হতে পেরেছিল। খুলনার দুর্ভিক্ষের সময় আচার্য্য রায় বুঝেছিলেন যে, যদি অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তবে দেশবাসী অর্থ-সাহায্য করতে কাতর নয়। সেই বিশ্বাসে তিনি আবার দেশবাসীদের আহ্বান করলেন এই বন্যায় সাহায্য করবার জন্য। কেবল যে বাংলাদেশ তা নয়, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভারতের নানা প্রদেশ থেকে সাহায্য আসতে লাগ্ল। এমন কি ভারতের বাইরে যে সব ভারতবাসী আছেন তাঁরাও সাহায্য পাঠালেন। জাপান থেকেও ভারতীয়রা সাহায্য করলেন। এই রকমে প্রায় সাত লক্ষ টাকা ভিক্ষা করে পাওয়া গেল। আচার্য্য রায় তাঁর যুবক-মণ্ডলীর সাহায্যে এই টাকা বন্যা-পীড়িতদের দুঃখ দূর করতে ব্যবহার করলেন।

বন্যার জল যখন শুকিয়ে গেল; তখন চারিদিকে রোগ দেখা দিল। তার জন্য বন্যাস্থলে রিলিফ কমিটী সুযোগ্য ডাক্তার পাঠিয়ে দিলেন। নানা স্থানে চিকিৎসার কেন্দ্র খোলা হল। সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা হল।

কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী রইল। কৃষকদের বাঁশের বাড়ী নির্ম্মাণ চলতে লাগ্‌ল। তখন প্রশ্ন উঠ্‌ল—এদের জীবিকা নির্ব্বাহ হবে কি করে? গরু ছাগল সব বন্যায় ভেসে গেছে, চাষের কোন উপায় নেই। শেষে বিলাতী লাঙ্গল (Tractor) দিয়ে অনেক জমি চাষ করিয়ে দেওয়া হল।

এবারও আচার্য্য রায় দেখলেন যে বাংলার কৃষক-সম্প্রদায় বৎসরের অর্দ্ধেক কেবল গল্প-গুজবে ও আলস্যে কাটায়। সেজন্য তিনি এই বন্যা-পীড়িতদের আহ্বান করে বল্‌লেন যে যদি তারা অবসর সময়ে চরকা কাটে, তবে তারা প্রতিদিন কিছু কিছু আয় করতে পারে। বিশেষতঃ বিধবা মেয়েরা ও নিষ্কর্ম্মা লোকেরা সহজেই চরকায় মন দিতে পারে। তিনি হিসাব করে বলেন যে যদি বাংলাদেশে লোক-সংখ্যা হয় সাড়ে চার কোটী, আর এর মধ্যে দেড় কোটী নরনারী যদি চরকা কেটে মাত্র প্রতিদিন দু পয়সা উপায় করে, তবে মাসে তাদের সকলকার আয় দাঁড়ায় দেড় কোটী টাকা অর্থাৎ বৎসরে

আঠার কোটী টাকা। যদি শুধু চরকা কেটে এই আঠার কোটী টাকা বাংলার জাতীয়-ধনে রক্ষা করা যায়, তবে ত খুব আনন্দের কথা।

আচার্য্য রায়ের উৎসাহে বন্যাস্থলে ঘরে ঘরে চরকা চলতে লাগ্‌ল এবং সেই সূতায় যে খাদি প্রস্তুত হতে লাগ্‌ল, তা বাজারে শীঘ্রই প্রসিদ্ধি লাভ করল। সেই বিক্রয়লব্ধ টাকায় নতুন তূলা কেনা হতে লাগ্‌ল।

এ সম্বন্ধে তিনি কোকনদের নিখিল ভারত খদ্দর-প্রদর্শনীর উদ্বোধনে বলেন—"কৃষিকার্য্যে কৃষক বৎসরে ৮ মাস কাল বা তদপেক্ষাও অল্প সময় ব্যয় করে—অবশিষ্ট সময় আলস্যে নষ্ট হয়। পুরুষদিগের সম্বন্ধে এই কথা। স্ত্রীলোকেরা বৎসরে সর্ব্ব সময়েই চরকার সূতা কাটিতে কতকটা সময় ব্যয় করিতে পারেন এবং তাহাতেই সমগ্র পরিবারের বস্ত্রের অভাব দূর করা যায়। খুলনায় দুর্ভিক্ষে ও পূর্ব্ববঙ্গে জলপ্লাবনে বিপন্ন জনগণের মধ্যে চরকা প্রচলিত করিয়া আমি বুঝিয়াছি, চরকা ব্যবহার করিলে এক বৎসরে অজন্মায় কৃষক অনাহারে সপরিবারে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহে চরকা চালন করিয়া কৃষকেরা যে ফল পাইয়াছে, তাহাতে চরকাকে তাহারা বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়া বিবেচনা করে।"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দানশীলতা

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের দানশীলতা সর্ব্বজনবিদিত। বিশেষভাবে ছাত্রসমাজ তাঁর দানের পাত্র। অনেক দরিদ্র ছাত্র তাঁর সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাশিক্ষা করতে পেরেছে। যখন তিনি প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হন, তখন থেকেই তিনি তাঁহার বেতনের অধিকাংশ দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। সুখের বিষয় সেই সব দরিদ্র ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই এখন সংসারে উন্নতি লাভ করেছেন।

এ ছাড়া তিনি বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য ১৯২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকা দান করেন। এই টাকা থেকে প্রতি বৎসর একটী পারিতোষিক দেওয়া হবে। যিনি বিজ্ঞান-মন্দির থেকে রাসায়নিক বিজ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণা করবেন তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এ পুরস্কারের পরিমাণ হবে একটী স্বুবর্ণ মেডেল যার দাম একশত টাকা ও নগদ পাঁচশত টাকা। প্রাচীন ভারতের স্বনামধন্য রাসায়নিক নাগার্জ্জুনের নামে এই পুরস্কারের নামকরণ হবে।

এই সম্পর্কে আচার্য্য রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে এই চিঠিখানি লেখেন :—

University College of Science,
92, Upper Circular Road,
Calcutta, 24th March, 1922.

My dear Sir Asutosh,

On your invitation, I joined the College of Science from its very inception and I have always tried my best to foster the spirit of research among those among whom I have been working. It is now my desire to place at the disposal of the University a sum of Rs. 10,000 representing the best part of my life's savings for founding an annual prize to be awarded for the best piece of research work in Chemistry, Pure or Applied, by any student working in the College of Science. The prize shall be open to competition among all graduates of this

University. The Board of adjudicators for the prize shall be constituted as follows :—

Palit Professor of Chemistry,
Ghosh Professor of Chemistry,
Ghosh Professor of Applied Chemistry,
Singh Professor of Chemistry.

One other expert, nominated annually by the four members of the Board.

The award shall be made by the Syndicate on the recommendation of the Board of Adjudicators.

The prize shall consist of a gold medal of the value of Rs 100 and Rs 500 in cash.

The prize is tobe called the *Nagarjuna Prize* after the great Indian chemist of that name whose accurate observations and painstaking investigations have justly elicited the applause of succeeding generations and who, as described in my History of Hindu

Chemistry, is looked upon as the precursor of chemical activity in this our ancient land.

If in the opinion of the adjudicators the work in any year is not up to the mark, the prize should be withheld for that particular year and would be awarded on any subsequent occasion.

Yours Sincerely,

P. C. Ray.

স্যর আশুতোষের আহ্বানে তিনি সরকারী কার্য্য ত্যাগ করবার পর বিজ্ঞান-মন্দিরে যোগদান করেন। তাই তিনি এখন স্যর আশুতোষের হাতে তাঁর জীবনের সঞ্চয় দশ হাজার টাকা অর্পণ করেন।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র শিক্ষা-প্রচারের জন্য যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেন। তাঁর জন্মভূমিতে তাঁর পিতৃপ্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যালয় আছে, তার জন্য তিনি নিয়মিত অর্থদান করেন। কলিকাতার সিটি কলেজও তাঁর সাহায্যে বঞ্চিত নয়। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষার জন্যও অনেক দান করেছেন। তাঁর বিশ্বাস যে, যদি দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত না হয়, তবে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সেই জন্য তিনি তাঁর নিজের

গ্রামে ও জেলায় শিক্ষাপ্রচারের জন্য দশহাজার টাকা দান করেছেন। যাতে এই অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, সেজন্য তিনি একটি শিক্ষা-সমিতির (Council of Education) হস্তে শিক্ষার ব্যবস্থার ও অর্থ ব্যয়ের ভার দিয়েছেন।

১৯১৮ সালে যখন আচার্য্য রায় মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যে পারিশ্রমিক দেন, তিনি তাহা নিজে গ্রহণ না করে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করেন। সেই অর্থে তিনি ভারতবন্ধু Wedderburn-এর নামে একটি পুরস্কারের সৃষ্টি করেন। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ছাত্র রসায়নশাস্ত্রে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গবেষণা করবেন, তাঁকেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আবার যখন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি লাহোরে বক্তৃতা দেন, সেবারও তিনি সমস্ত টাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করেছিলেন।

১৯২৫ অব্দে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নাগপুরে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। এবারও তিনি পথখরচ বাদ সব টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফিরিয়ে দেন।

বিজ্ঞান-মন্দিরের স্থাপনার প্রথম থেকেই আচার্য্য রায় রসায়নশাস্ত্রের পালিত অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু পালিত ট্রাস্টের নিয়ম অনুসারে অধ্যাপকের ষাট

বৎসর বয়স হলে কর্ম্মত্যাগ করা দরকার, তবে ট্রাষ্টীরা এর ব্যতিক্রম করতে পারেন। যখন আচার্য্যের বয়স ষাট বৎসর পূর্ণ হল, তিনি পদত্যাগ-পত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ' কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আরও পাঁচ বৎসরের জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়কে যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর হৃদয়ের মহত্ত্বই প্রকাশ পায়। তিনি লেখেন—"আমার জীবনের বাকী দিনগুলি বিজ্ঞানমন্দিরের পরীক্ষাগারে কাটিয়ে দিতে খুবই ইচ্ছা করি, কিন্তু এই কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে আর অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে আমি অক্ষম। সেই জন্য আমার নিবেদন যে পালিত অধ্যাপকের প্রাপ্য মাসিক একহাজার টাকা আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রত্যর্পণ করছি, যাতে এই টাকা বিজ্ঞানমন্দিরে রাসায়নিক বিভাগে ব্যয় হতে পারে।"

এই রকমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬০,০০০ টাকা প্রত্যর্পণ করে' আদর্শ গুরুর ন্যায় বিজ্ঞান আলোচনায় রত হলেন। প্রাচীন ভারতে অধ্যাপকদের যে আদর্শ ছিল, প্রফুল্লচন্দ্র সেই আদর্শ যুবকসমাজের কাছে উপস্থিত করলেন। সমস্ত ভারত মুগ্ধ হয়ে তাঁর স্বার্থত্যাগের কথা শুনল।

কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠদান করলেন খাদি প্রচারের জন্য। যাতে দেশময় খাদিপ্রচার হয় সেজন্য তিনি তাঁর আজীবনের সঞ্চয় দান করলেন। যখন তিনি দলিল করে' এই দান তাঁর মনোনীত ট্রাষ্টীদের হাতে সমর্পণ করেন, তখন তিনি সে কার্য্য খুব সংগোপনে করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যেন জনসাধারণে তাঁর দানের কথা জানতে না পারে। কিন্তু কোন উপায়ে সেই দানের কথা সাধারণে জানতে পার্‌ল। সকলে বুঝ্‌ল যে আচার্য্য রায় তাঁর সর্ব্বস্ব দধীচির ন্যায় দেশের কাজে উৎসর্গ করেছেন। তিনি আজীবন প্রায় ৫৬০০০৲ টাকা—বেঙ্গল কেমিক্যাল ও অন্যান্য কোম্পানীর 'শেয়ার'—সঞ্চয় করেছিলেন। এই সমস্ত টাকা তিনি তাঁর প্রিয় কার্য্যে নিয়োজিত করলেন। সারা ভারত তাঁর স্বার্থত্যাগের কথা শুনে বিস্মিত হল।

তাঁর দানশীলতা সম্বন্ধে একখানি সংবাদপত্র (Times) লেখেন—"Fully nine-tenths of his income goes to the support of poor students in Calcutta; and he is deeply revered by the great throng of undergraduates in the city."

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জাতীয় শিক্ষা

আচার্য্য রায় জাতীয় শিক্ষায় বিশ্বাস করেন। যখনই জাতীয় শিক্ষা দেবার জন্য নতুন কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বা কোন চেষ্টা হয়েছে, তখনই তিনি তাতে সাহায্য করেছেন। বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেবারও তিনি পক্ষপাতী। তিনি জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী বলে' স্যর আশুতোষ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁকেই "জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" (National Council of Education) সভাপতি করা হয়েছে। তাঁরই উৎসাহে ও চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

এই কারণেই ১৯২৩ সালে আলিগড় জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় উপাধিদান সভায় তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন তা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সংক্ষেপে ইসলামীয় সভ্যতার ইতিহাসের কথা বলেন ও ইসলামীয় সভ্যতা জগতকে কি দান করেছে তারও উল্লেখ করেন। তিনি

নিজে একজন বৈজ্ঞানিক, সুতরাং ইতিহাসে তাঁর গভীর প্রবেশ দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে যান।

এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, যখন তিনি আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে এই আহ্বান পান তিনি আশ্চর্য্য হন যে, তাঁর মত একজন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিককে উত্তরভারতের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে কেন ডাকা হল। হয়ত তিনি নিজে শিক্ষাবিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বলে' এই শিক্ষার কেন্দ্রে তাঁর আহ্বান হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা মন্ত্র হওয়া উচিত যা স্যর আশুতোষ বলেছিলেন— Freedom first, freedom second, freedom always। কিন্তু এই স্বাধীনতা বলতে তিনি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতার কথা বলেন নি, তার দ্বারা তিনি মনের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার কথাও বলেছিলেন।

এ-সম্বন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন :—

"আমি ত আজীবন গোলামখানায় দাসখত লিখিয়া বসিয়া আছি। ২৫।২৬ বৎসর চাকুরী করিয়া পেন্সন ভোগ করিতেছি। বাংলার ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডসে স্বয়ং আমাকে পত্র লিখিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের

মেম্বার করিয়া দিয়াছেন। আমি বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অবৈতনিক অধ্যাপক। এইরূপে আমি অনেকগুলি গোলামখানার সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছি।

"আমি গোলামখানার সহিত সম্পর্কিত হইলেও মুসলমানগণ আমাকে আলিগড় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ উপলক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাকিম আজমল খাঁ প্রথমে ঐজন্য আমাকে তার করেন। আমি জানাইলাম, আমার কাজ অনেক, এখন যাওয়া সম্ভব নহে। তখন হাকিম আজমল খাঁ ও ডাক্তার আন্সারী উভয়ে মিলিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কয়দিন পরেই সেই আমিই আবার সবরমতী গুজরাট বিদ্যাপীঠে—যেখানে মহাত্মার আশ্রম—তাহার ভিত্তিসংস্থাপনের জন্য আহূত হই।"

(বঙ্গবাণী, ফাল্গুন, ১৩৩০)

এ-ছাড়া তিনি আমেদাবাদ বিদ্যাপীঠের গৃহস্থাপনা উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হয়ে যান। সেখানেও তিনি জাতীয় শিক্ষাপ্রচারের কথা বলেন।

উৎকল প্রাদেশিক কন্ফারেন্স

যদিও আচার্য্য রায় প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক বলেই পরিচিত সাধারণের কাছে, তবু তাঁর কার্য্যের পরিধি এতদূর এখন

বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, ভারতের নানাস্থান থেকে তাঁর আহ্বান আস্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর যশঃ শুধু বাংলায় সীমাবদ্ধ রইল না, সেটা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। তাই বাংলার বাইরে থেকে তাঁর নামে ডাক আস্‌তে লাগ্‌ল। গত ১৯১৯ সালে আসামের ছাত্রবৃন্দ তাঁকে আসাম ছাত্রমণ্ডলীর সভাপতি হবার জন্য আহ্বান করেন। সেখানে তিনি বলেন, "গত ত্রিশ বৎসর আমি শিক্ষকের পবিত্র কাজে ব্রতী আছি। এতকাল আমি বাংলার ছাত্রসমাজের মধ্যে বাস করে আস্‌ছি, ছাত্রদের যা আনন্দ আমারও সেই আনন্দ, তাদের যা দুঃখ আমারও সেই দুঃখ। তাদের আশা-ভরসার, সুখ-দুঃখের আমি অংশীদার। তাই তোমরা ছাত্রবৃন্দ, যখন আমায় আহ্বান কর্‌লে, তখন আমি তোমাদের কথা না শুনে থাকতে পার্‌লাম না। আমি ছাত্রবর্গে পরিবৃত হয়ে থাকি বলে, জরাবার্দ্ধক্যেও শক্তি-সামর্থ্যের উপচয় ভুলে যাই।"

যখন ১৯২৪ সালে আচার্য্য রায় উৎকল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি হয়ে গেলেন, তখন তিনি উৎকল-বাসীদের তাদের প্রাচীন গৌরবের কথা, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, পুরী, ভুবনেশ্বর ও কণারকের মন্দিরের কথা, তাদের প্রধান কবি নারায়ণ পণ্ডিত, হলধর দাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ

প্রভৃতির কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এ ছাড়া কি করে শিক্ষায়, সামাজিক সংস্কারে ও সকল রকমে উৎকলের উন্নতি করা যেতে পারে, সে কথাও তিনি বলেন।

এই সব উপলক্ষে ও সিরাজগঞ্জ ছাত্রসম্মিলনীতে সভাপতিরূপে (১৩৩১ সনে) তিনি বলেন :—"আমি তোমাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি যে সকলে টেনে এনে আজকার সভাপতিপদে আমাকে বরণ করেছ। ছাত্রেরা ডাকলে আমি না সাড়া দিয়ে থাকতে পারি না, তারা ভবিষ্যতের আশা, তাদের দিকে চেয়ে এই বৃদ্ধবয়সেও বেঁচে আছি। বাঙ্গালী ছাত্রদের দ্বারা অসাধ্যসাধন হবে, শুধু যোগ্য নেতার অভাব, পরিচালকের অভাব। উপযুক্ত নেতা থাক্‌লে কি হতে পারে তা জগলুল পাশা, মুস্তাফা কামাল পাশার কথায় বলেছি। বিপদ সকল দিক দিয়ে দেখা দিয়েছে, মুসলমানদেরও এ ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নাই। এখন ভাবতে হবে, চিন্তা করতে হবে যে, আবহমানকাল থেকে যা চলে আস্‌ছে তাকে আঁকড়ে ধরে থাক্‌বার যে প্রবৃত্তি তাকে কি করে নষ্ট করা যায়। কত রকম সামাজিক ব্যাধি রয়েছে, এ দূর না করলে জাতি গঠন হবে না। একটা জাতিকে উঠ্‌তে হলে সামাজিক,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব দিক দিয়ে তাকে এগুতে হবে, শুধু একদিক দেখ্‌লে চল্‌বে না।”

রাজনীতিক্ষেত্রে আচার্য্য রায়

আমরা দেখেছি যে আচার্য্য রায় তাঁর প্রথম জীবনে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্ব্বেও তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দেন নাই। তখন তিনি নিজের বিজ্ঞানমন্দিরে গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, কখন কখন সামাজিক সমস্যা নিয়ে ছাত্র-মহলে আলোচনা করতেন বা বাঙ্গালী ছাত্রকে অর্থনৈতিক সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের আরম্ভের সময়ও তিনি সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু খুলনা দুর্ভিক্ষের পর থেকে তিনি চরকার কার্য্যকরিতায় বিশ্বাস করলেন ও সেই সময় থেকে তিনি চরকা ও খদ্দর প্রচারের ভার গ্রহণ করলেন। ক্রমে তিনি কংগ্রেসে সভ্যরূপে যোগ দিলেন। তখন থেকে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে দেখা দিলেন এবং রাজনৈতিক হিসাবে উৎকল, কোকনদী ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসতে লাগ্‌ল। এই উপলক্ষে তিনি সারা ভারতময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে আচার্য্য রায়

যদিও আচার্য্য রায় রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিয়েছেন, তবু তিনি তাঁর বিজ্ঞান সাধনা ছাড়েন নি। এখনও তিনি বিজ্ঞান-মন্দিরে নিয়মিত সময়ে তাঁর ছাত্রমণ্ডলীর সঙ্গে বিজ্ঞানের গবেষণা করেন। তাঁর অধীনে ছাত্রেরা দিনদিন নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কার করছে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকে নিজের গবেষণার জন্য "ডাক্তার" উপাধিলাভ করেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক কাজ সম্বন্ধে তিনি বলেন :— "অনেকে বলেন যে আমি এখন তাঁত, চরকা, টানা, নলী নিয়ে থাকি এবং রসায়নশাস্ত্র ভুলে গেছি, কিন্তু গত দুই বৎসরে স্বাধীন গবেষণামূলক আমার যত প্রবন্ধ বেরিয়েছে তেমন জীবনে হয় নাই; প্রমাণস্বরূপ এই আমার senior research scholar অর্থাৎ সর্দার, পড়ুয়া' সঙ্গে আছেন, ইহাঁর নিকট সকল তথ্য অবগত হতে পারবেন। আমি রাত্রিতে মোটেই পড়ি না, কিন্তু ২৪ ঘণ্টার ভিতর ১০ ঘণ্টা বাদ দিলেও বাকী ১৪ ঘণ্টায় কত কাজ করা যায়।"

আচার্য্যের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের জন্য ১৯২০ সালে তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের (Science Congress) সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সভাপতিরূপে তিনি "বর্ত্তমান

ভারতে বিজ্ঞানের আবির্ভাব” সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী কাজ দেওয়া হয় না বলে, ভারতীয়রা তাদের জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে না। আর এই জন্যই ভারতে বিজ্ঞানের সকল বিভাগে ভারতীয়রা প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে, Geological Surveyতে ১৬টি পদ আছে ও Trigonometrical Surveyতে ৪৬টি পদ আছে, কিন্তু এর মধ্যে একটিও ভারতবাসী পান নাই। সেজন্য তিনি বড় গলায় বলেন যে, সরকারী বৈজ্ঞানিক বিভাগে আরও অধিক পরিমাণে ভারতীয়দের কাজ দেওয়া দরকার। একমাত্র এই উপায়েই সকল বৈজ্ঞানিক বিভাগে ভারতবাসীর প্রতিভার বিকাশ হতে পারে। কিন্তু আচার্য্য রায়ের এই বক্তৃতা শুনে অনেক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হলেন, তাঁরা বল্লেন—“এ যে ধান ভান্‌তে শিবের গীত! বিজ্ঞান কংগ্রেসে বসে ডাক্তার রায় রাজনীতির চর্চ্চা আরম্ভ করেছেন।” অবশ্য, যখনই ভারতীয়দের বড় পদ দেবার কথা বলা হয়, তখনই একদল ভারতহিতৈষী ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে পড়েন।

এই কথাই আচার্য্য রায় আবার Chemical Service Committee-র সভ্যরূপে আরও দৃঢ়ভাবে বলে-

ছিলেন। যাতে Chemical Service গঠিত হলে ভারতবাসীরা তাতে কাজ পান, সেজন্য আচার্য্য রায় কমিটীকে বলেন।

রাসায়নিক গবেষণার সুবিধার জন্য ১৯২৪ সালে আচার্য্য রায়ের ছাত্রগণ ভারতীয় রাসায়নিক সমিতি (Indian Chemical Society) স্থাপন করেন। এক বৎসরের মধ্যেই এই সমিতি অনেকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রণের জন্য সমিতি একটি পত্রিকা প্রকাশের মনস্থ করেছেন। ১৯২৫ সালে আচার্য্য রায় এই সমিতির বার্ষিক সভায় সভাপতিরূপে বৃত হন। সভাপতিরূপে তিনি অক্সিজেন আবিষ্কার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ডেন্‌মার্ক এই আবিষ্কারের দাবী করেন। এ-সম্বন্ধে কেবল ভারতবর্ষই নিরপেক্ষভাবে বিচার করে বলতে পারে যে ফ্রান্সই প্রকৃত অক্সিজেনের আবিষ্কারক।

দেশবন্ধুর মৃত্যু

যখন আচার্য্য রায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে খুলনা জেলা পরিভ্রমণ করছিলেন তখন অকস্মাৎ খবর আসে যে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। সমগ্র বাঙালী জাতির

সহিত আচার্য্য রায়ও দেশবন্ধুর তর্পণ করেন। দেশবন্ধু সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ—"আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি বাংলার রাজনীতি আলোচনা দেখিতেছি; অনেকেই ইঁহার পূর্ব্বে কার্য্যে আত্মোনিয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দেশবন্ধুর ন্যায় অনন্যকর্ম্মা ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া স্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে এই প্রকার আত্মোৎসর্গ করিতে কদাপি দেখি নাই। যিনি ভোগলালসা ও বিলাসিতার মধ্যে আশৈশব মানুষ হইয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সেও তাহাতে ডুবিয়া ছিলেন তিনিই এক মহা শুভ মুহূর্ত্তে দেশের পক্ষে এক মহা মাহেন্দ্রক্ষণে সকল ছাড়িয়া, রিক্ত হইয়া, বহু শতাব্দী পূর্ব্বেকার কপিলাবস্তুর রাজপুত্রের ন্যায় পরিণাম বিবেচনা না করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন।"

পঞ্চদশ অধ্যায়
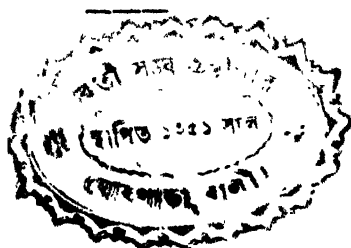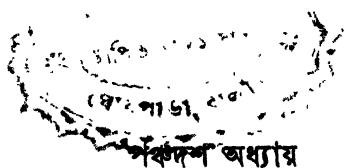
উপসংহার

আচার্য্য রায় বাংলার ছাত্রমহলের গুরুস্থানীয়। সারা-জীবন তিনি নিজে নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর ন্যায় অতিবাহিত করেছেন। জীবনে তিনি বিদ্যা অর্জ্জন ও বিদ্যা দান—এই দুই ব্রত গ্রহণ করেছেন। প্রকৃত ছাত্রের ন্যায় তিনি "অধ্যয়নই তপস্যা"—এই মন্ত্রসাধন করেছেন। কিরূপে দেশে শিক্ষার প্রচার হবে, কিরূপে দরিদ্র ছাত্রগণ বিদ্যা উপার্জ্জন করবে—এই তাঁর একমাত্র চিন্তা। প্রাচীন ভারতে যে আদর্শ গুরুর কথা আমরা পড়েছি, আচার্য্য রায়ের মধ্যে সেই আদর্শ জীবন্ত দেখতে পাই। আদর্শ গুরুর মত সব সময় তিনি নিজের প্রিয় ছাত্রদের দ্বারা পরিবৃত রয়েছেন। কেবল ছাত্রদের মঙ্গলচিন্তায় তিনি রত।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে আচার্য্য রায় দেশপ্রসিদ্ধ। তিনি যে রাসায়নিক রূপে শুধু বাংলা দেশে পরিচিত তা নয়, সারা ভারত, এমন কি ভারতের বাইরে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে ও জার্ম্মানীতেও তিনি সুপরিচিত। ইউরোপের প্রধান প্রধান বৈজ্ঞানিকগণও তাঁর গবেষণার সমাদর করেন। আদর্শ গুরুর ন্যায় তিনি একদল শিষ্য তৈরী করেছেন, যাঁরা

সমবেত ভাবে Bengal School of Chemistry বলে' বৈজ্ঞানিক জগতে পরিচিত। তাঁর ছাত্রদের গবেষণায় তাঁর কীর্ত্তি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেও আচার্য্যের নাম বাংলার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল থাকৃবে। তিনি চেষ্টা করেছেন যাতে সমাজের ব্যাধিগুলি দূর হয়ে যায়। যাতে হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয় তার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। অস্পৃশ্যতা ও ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে তিনি অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন।

বাংলাসাহিত্যেও তাঁর দান কম নয়। তিনি বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি করেছেন। তাঁর "প্রাণিবিজ্ঞান" ও "নব্য রসায়নী বিদ্যা" বাংলা সাহিত্যে তাঁর নাম স্মরণীয় করে রাখবে। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অনেক আছে, যেমন—(১) রসায়ন শাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন, (২) লাভাসিয়ে ও নব্য রসায়ন, (৩) প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়নজ্ঞান চর্চ্চা। এ ছাড়া বাংলা-সাহিত্যে তাঁর "অন্ন-সমস্যা" ও "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" চিরকাল থাকৃবে। শুধু তাই নয়, দানবীর বলে আচার্য্যের নাম ভারতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকৃবে। আজীবন তিনি তাঁর দানশীলতার জন্য সর্ব্বপরিচিত। শিক্ষার জন্য, দেশের উন্নতির জন্য,

প্রচারের জন্য তিনি তাঁর সর্ব্বস্ব দধীচির ন্যায় বিতরণ করেছেন।

আচার্য্য রায় জগতকে দেখিয়েছেন যে, বাঙ্গালী শুধু কেরাণী হতে জানে না, ব্যবসার ক্ষেত্রেও তারা প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে। বেঙ্গল কেমিক্যাল—আচার্য্য রায়ের অক্ষয় কীর্ত্তি।

আচার্য্য রায় বাংলার তথা ভারতের ছাত্র-সমাজে সুপরিচিত। তিনি ছাত্র-মহলে এক নতুন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন। তিনি ছাত্র-সমাজকে এক নতুন পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রাচীন ভারতের আদর্শ গুরুর মত। তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর সাধনা, তাঁর স্বার্থত্যাগ সেই—প্রাচীনকালের গুরুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই কবির ভাষায় বলতে হয়ঃ—

"ভারতের কোন্ বৃদ্ধ ঋষির তরুণ মূর্ত্তি তুমি
হে আর্য্য আচার্য্য ?"

তিনি নিজে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র তৈরী করে নিয়েছেন। তাই জিজ্ঞাসা করতে হয় —

"কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে—পাষাণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?"

তাঁর আদর্শে, তাঁর ভাবে ছাত্রসমাজ উদ্বোধিত হয়ে উঠ্ছে। তাঁর প্রভাব অনেকদিন ছাত্রবৃন্দকে উৎসাহের

সঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর করাবে। তাঁর সারা জীবনের কাহিনী পড়ে মনে হয় :—

—"হে তপস্বী, ডাক তুমি সামমন্ত্রে জলদ গর্জ্জনে
'উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!' ডাক শাস্ত্র-অভিমানিজনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হ'তে! সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দাম্ভিকেরে! ডাক দাও তব শিষ্যদলে—
একত্রে দাঁড়াক তা'রা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া!
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক্ ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে—বসুক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে!"

(রবীন্দ্রনাথ—স্বদেশ)
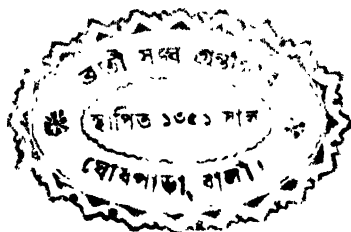
পরিশিষ্ট

(ক) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের বাংলা বই

১। বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার

২। অন্নসমস্যা

৩। জাতিভেদ ও পাতিত্যসমস্যা

৪। জাতিগঠনে বাধা—ভিতরে ও বাহিরে

৫। সাধনা ও সিদ্ধি

৬। মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রয়

৭। সমাজ-সংস্কার

৮। অধ্যয়ন ও সাধনা

৯। প্রাণি-বিজ্ঞান

(খ) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রবন্ধরাজি

বঙ্গবাণী

১। বস্ত্রসমস্যা—১৩২৯, শ্রাবণ, পৃঃ ৬৭৪

২। বন্যায় শিক্ষা—১৩২৯, চৈত্র, পৃঃ ১২৭

৩। কোকনদ খদ্দর প্রদর্শনী—মাঘ, ১৩৩০, পৃঃ ৭১৫

৪। প্রাচীন ভারতে রসায়নশাস্ত্র চর্চ্চা—অগ্রহায়ণ, ১৩৩০, পৃঃ ৪২১

৫। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা, ফাল্গুন, ১৩৩০, পৃঃ ১

৬। দিনাজপুর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির অভিভাষণ—শ্রাবণ, ১৩৩১, পৃঃ ৬৬৯

৭। বর্ত্তমান যুগসমস্যা ও ছাত্রগণের কর্ত্তব্য—কার্ত্তিক, ১৩৩১, পৃঃ ৩৫১

৮। মিথ্যার সহিত আপোষ ও শান্তিক্রম—অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, পৃঃ ৩৯৫

৯। সার আশুতোষের জীবনচরিত—অগ্রহায়ণ, ১৩৩১, পৃঃ ৫০৮

১০। স্মৃতি-তর্পণ—১৩৩২, শ্রাবণ, পৃঃ ৭০২

১১। বিবেকানন্দ ও বর্ত্তমান বাংলা—ভাদ্র, ১৩৩২, পৃঃ ৪১

(শ্রী কলিঙ্গনাথ ঘোষের সহযোগে লিখিত)

বঃ

১।	বাঙ্গালা ভাষায় নূতন গবেষণা	১ম বর্ষ	জ্যৈষ্ঠ	পৃঃ	১৮১
২।	বাঙ্গালীর প্রতি নববর্ষের সম্ভাষণ	,,	বৈশাখ	,,	৩৯
৩।	সভ্যতার মাপকাঠি	,,	আষাঢ়	,,	২৭৩
৪।	অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতা	,,	ফাল্গুন	,,	৫৪৯
৫।	খদ্দর বলিতে আমি কি বুঝি?	,,	মাঘ	,,	৪১৩
৬।	রসায়নশাস্ত্র—নব্য ও প্রাচীন	,,	অগ্রহায়ণ	,,	১৩৭
৭।	লাভাসিয়ে ও নব্য রসায়ন-শাস্ত্রের উৎপত্তি	,,	পৌষ	,,	২৮৩
৮।	খদ্দর পরিব কেন?	২য় বর্ষ	ভাদ্র	,,	৫৯৭
৯।	সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার	,,	শ্রাবণ	,,	৪৪৫
১০।	কোকনদ কংগ্রেস	২য় বর্ষ,	২য় ভাগ,	,,	৪৩৮
১১।	খাদির সার্থকতা			,,	১৩৭
১২।	বাঙ্গালীর শক্তিসামর্থ্যের অপব্যবহার			,,	১
১৩।	বর্ত্তমান সমস্যা	৩য় বর্ষ	আষাঢ়	,,	৩২৫
১৪।	সভাপতির অভিভাষণ	,,	শ্রাবণ	,,	৫৭৯
			কার্ত্তিক	,,	৭৬

১৫।	বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ধারা	,,	ফাল্গুন	,,	৬৭৭, ৮০৫
১৬।	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন	৪র্থ বর্ষ	আষাঢ়	,,	৩৮১
১৭।	প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন-জ্ঞান-চর্চ্চা	,,	জ্যৈষ্ঠ	,,	১৮৩
১৮।	বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের ধারা	,,	বৈশাখ	,,	৬
১৯।	সুরেন্দ্রনাথের তিরোধান	,,	(ভাদ্র)	,,	১

"প্রবাসী"তে প্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা দেওয়া হল না, কারণ সেগুলির বেশীভাগ বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে।
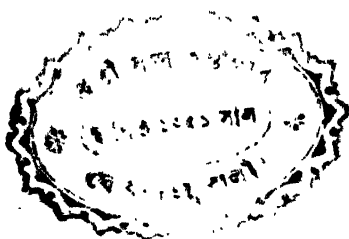
বিশ্বভারত গ্রন্থমালা

১। শেক্সপিয়রের গল্প—শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী
এম-এ, বি-এল্ ৸৹

২। মাটির নেশা (টলষ্টয়ের গল্প)—শ্রী দুর্গামোহন
মুখোপাধ্যায় বি-এ ।৹

৩। হ্যামলেট (শেক্সপিয়রের গল্প) শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী ।৵৹

৪। ধর্ম্ম-পুত্র (টলষ্টয়ের গল্প) শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি-এ ।৹

৫। সব ভাল যার শেষ ভাল (শেক্সপিয়রের গল্প)
শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী ।৵৹

৬। বোকার কাণ্ড (টলষ্টয়ের গল্প) শ্রী দুর্গামোহন
মুখোপাধ্যায় ৸৹

৭। কুঁদুলীর শিক্ষা (শেক্সপিয়রের গল্প)
শ্রী শিশিরকুমার নিয়োগী ।৵৹

৮। আজব ঘুম (রিপ্ ভ্যান উইঙ্কল্)
শ্রী দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় ।৹

৯। ঝড় (শেক্সপিয়রের গল্প) শ্রী কেদারনাথ মিত্র
এম-এ, বি-এল ।৵৹

১০। মজার ভুল (ঐ) ঐ ।৵৹